বীতংস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বইয়ের সব শর্ট গল্পই নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে আহরিত।

'বীতংস' আমার প্রথম গল্পের বই। রচনাগুলির নির্বাচনে বন্ধুবর অধ্যাপক বীরেন লাহিড়ী এবং বান্ধবী আশা সান্যালের সহায়তা পেয়েছি— তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে 'বীতংস' আত্মপ্রকাশ করতে পারল, বইটি তাঁকেই নিবেদন করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য সানন্দে গ্রহণ করছি।

নববর্ষ দিবস
১৩৫২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় কথাকার

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর

করকমলে

সূচী ঃ

বীভৎস

সংসার-আশ্রমে থাকবার আর কোনো অর্থ হয় না।

সুন্দরলালের মোহ কেটে গিয়েছে অন্তত। আজ যে তোমার বন্ধু, সামান্য স্বার্থের জন্যে কাল সে তোমার গলা টিপে ধরতে পারে; বড় আদরের যে সহোদর ভাইটিকে তুমি একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারো না, এক ছটাক জমির জন্যে কাল হয়তো সে তোমার নামে এক নম্বর ফৌজদারী রুজু ক'রে দেবে; যে রূপবতী স্ত্রীর পায়ে যথাসর্বস্ব পণ ক'রে তুমি কাপড়ে গহনায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দিচ্ছ, একদিন ভোরবেলা হয়তো দেখবে গাঁয়ের ছট্টু তেওয়ারীর সঙ্গে সে রাতারাতি হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। সুতরাং মোহ-মুদ্গরের ভাষায় একদিন 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' ব'লে বেরিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবং সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক। তাই তিরিশ বছর না পেরোতেই সংসার ছেড়ে সুরু হয়েছে তার অগস্ত্য যাত্রা। কোনো বন্ধুই আজ আর তাকে পিছু টানে না। মহিষ চুরির ব্যাপার নিয়ে গাঁয়ের জমিদারের সঙ্গে এখন আর মামলা করতে হয় না। ছট্টু তেওয়ারীর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে দিনরাত চোখ কাণ খাড়া ক'রে বসে থাকবার দরকার নেই। পাথরের মতো নির্মম রাঙা মাটিতে কঠিন পরিশ্রমে লাঙল ঠেলে যদি ভালো গমের ফলন না করা যায়, তা হলেও এখন আর সম্বৎসরের ভাবনা ভাবতে হয় না।

এ জীবনের সঙ্গে তার কি তুলনা হয়? সামনে একখানা ছবির মতো নীল পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী। দুমকা যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, সেখান

থেকে এতটুকুও পোড়া পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ এসে এখানকার আকাশ বাতাসকে আবিল ক'রে দেয় না। হর্নের বিকট শব্দে ভয়ত্রস্ত গোরুর পাল এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় না; লাল রঙের বড় বাসখানা থেকে এক টুকরো পোড়া সিগারেট বা রেশমি শাড়ীর একটা চলতি ঝলক মুহূর্তের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যকর জগতের সংবাদ দিয়ে যায়, তার প্রভাব থেকেও এ জায়গাটা একেবারেই মুক্ত।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুমডুম ক'রে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়া বন আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপ জামের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলি তিক্তমধুর রসে টস্‌টস্‌ করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়। সত্যিকারের আনন্দ তো এইখানেই। মোতিহারীর আদালতে যারা ফৌজদারী মামলার তদ্বির করে, কিম্বা সীতামারীর চিনির কলে আখের দালালী করেই যারা দিন কাটিয়ে যাচ্চে, তারা এর মর্ম কী বুঝবে?

তারা না-ই বুঝল। কিন্তু সুন্দরলাল বুঝেছে। এখানকার সাঁওতালদের মনের ওপর রীতিমতো আসন গেড়ে বসেছে সে। তারা তাকে শ্রদ্ধা করে, হয়তো বিশ্বাসও করে আজকাল। সুন্দরলাল গেরুয়া নেয়নি বটে, তবু সে সন্ন্যাসী। দণ্ডী কিম্বা ব্রহ্মচারী, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে সাঁওতালেরা কখনো ব্যগ্র হয়ে ওঠে না। সুন্দরলাল হাত দেখতে জানে, যা ব'লে তা নাকি হুবহু মিলে যায় সব। শিকড়-বাকড় সম্বন্ধেও তার প্রচুর জ্ঞান, বহু কঠিন রোগে তার ওষুধ নাকি অব্যর্থ ক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছে।

সে শৈব, না রামায়েৎ, না গাণপৎ এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু দেখা যায় তার কোনোটার ওপরেই বিদ্বেষ নেই। ব্যোম ভোলার নামে সে গাঁজার কলকিতে দম চড়িয়ে দেয়, সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। এখনো যারা "বোঙার" পূজোয় মুর্গী বলি দেয়, তাদের পূজোর প্রসাদ নিতে

তাকে কখনো আপত্তি করতে দেখা যায় না। সময় তো মোটে দু'মাস, কিন্তু এর মধ্যেই সাধু সুন্দরলাল মহাপুরুষ সুন্দরলালে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম করছে।

আকাশে সন্ধ্যার রঙ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের অরণ্যমণ্ডিত চূড়োয় চূড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল। শাল বন ঘেরা দূরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাশের প্রসারিত নিশ্চল বাহু। যেন মৃত্যুর আগে একবার ওই পাহাড়টাকে মুখের ভেতরে টেনে আনবার শেষ চেষ্টা করেছিল।······

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওই পথটা বেয়ে সুন্দরলালের ভুটানী খচ্চরটা নেমে এলো। এটা ওর সন্ন্যাসের সঙ্গী,—নাগা সন্ন্যাসীর লোটা চিমটার মতোই অপরিহার্য। সন্ন্যাসী হলেও সুন্দরলাল একেবারে বাবা ভোলানাথের মতো ছাই মেখে নিরংকুশ হয়ে বেরিয়ে পড়েনি, অশন-বসনের দায়টা সে মানে। তাই ডেরা তুলতে হ'লে তার ছোট্ট গাঁট্রিটাকে খচ্চরের পিঠেই বেঁধে নিতে হয়। তা ছাড়া কেন কে জানে, অন্তত সপ্তাহে একবার তাকে সহর থেকে ঘুরে আসতে হয়, শিষ্য-সামন্তদের দর্শন দেবার জন্যেই হয়তো। সেকারণেও খচ্চরটাকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই।

ছোট ছোট পায়ে খট্ খট্ করে হাঁটতে হাঁটতে খচ্চরটা একেবারে সাঁওতাল পাড়ার মাঝখানে এসেই থামল। মাথার পাগড়ীটা খুলে এক পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সুন্দরলাল। কাঁচা চামড়ায় তৈরী পুরোনো নাগরা জুতোটার কাঁটা লোহাগুলোতে একটা কর্কশ শব্দ বেজে উঠল, আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে ময়লা চাপকানটার লম্বা পকেটে ঝন ঝন ক'রে সাড়া দিলে কয়েকটি ধাতু মুদ্রা।

বহু দূর থেকে আসতে হয়েছে। খচ্চরটারও পরিশ্রম হয়েছে খুব। ঘাড়ের ওপরকার ছোট ছোট খাড়া লোমগুলোর তলাটা ঘামে ভিজে গেছে,

মুখের পাশে পাশে ফেনার আভাস। দড়ির লাগামটা ধরে তাকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সুন্দরলাল।

—কোথা থেকে এলে বাবাঠাকুর ?

প্রশ্ন শুনে সুন্দরলাল মুখ তুলে তাকালো। সামনে ঝড়ু সাঁওতাল। গ্রামের লোকে মোড়ল বলেই মান্য করে তাকে। পরণে বস্ত্রের বেশি বাহুল্য নেই, শুধু ছোট একটি ফালি নেংটির মতো ক'রে পরা। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে ঘিরে আর একটুকরো কাপড়, তার একপাশে গোটা তিনেক পালক গোঁজা। হাতে বাঁশের ছিলা দেওয়া কুচ্‌কুচে প্রকাণ্ড একটা ধনুক, আর সেই সঙ্গে গোটা কয়েক বাঁটুল।

—কে মোড়ল ? কী শিকার পেলি রে ?

—কিছু নয় বাবাঠাকুর। মহুয়া বনে গিয়েছিলুম হরিয়াল মারতে, কিন্তু বরাত খারাপ। তুমি কোথা থেকে এলে ?

—আমি ? প্রশান্ত হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল সুন্দরলালের মুখ। এ হাসিটাকে আধ্যাত্মিক মনে করলে দোষ হয় না। সাধনার পথে সে যে কতখানি এগিয়ে গেছে, এ হাসি দেখে তার কিছুটা অনুমান করা চলে :

—আমি ? আমি গিয়েছিলুম ওপারের ওই গাঁয়ে। ওখানে একজনকে ভূতে ধরেছিল কিনা, এসে বড্ড কান্নাকাটি করছিল। তাই একবারটি ঝেড়ে দিয়ে আসতে হ'ল।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ঝড়ু একবার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলে সুন্দরলালের। সত্যি কথা,—সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণ নেই সুন্দরলালের শরীরে। চুলটি দিব্যি ক'রে আঁচড়ানো, চাপকানের পকেট থেকে পিতলের ডিবে বের ক'রে তা থেকে মস্ত একটা খিলিপান মুখে পুরে দিলে। জর্দার চমৎকার গন্ধটা দস্তুরমতো লোভনীয়। চলার সঙ্গে সঙ্গে পকেটের টাকাগুলো ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠছে।

তবু সুন্দরলাল যে সাধু মোহান্ত, তাতে সন্দেহ করবার হেতু কী !

মুগ্ধ বিস্ময়ে ঝড়ু বললে, ভূত ছাড়ল ?

—ছাড়বে না ? চালাকি নাকি ? একি যে সে মন্ত্র! হিমালয়ের চূড়োয় পাঁচ শো বছর ধরে ধ্যান করছেন নাঙ্গা বাবা। ইয়া লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি, লুটিয়ে পড়েছে একেবারে পা পর্যন্ত। আর সে কী চেহারা, দাঁড়ালে তালগাছের মাথায় গিয়ে ঠেকে। সেবার আমি নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে ধ্যান করছি বসে। মাঝ রাত্তির ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার—হঠাৎ যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাকিয়ে দেখি ওই মূর্তি—পেছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে।

সূর্য অস্ত গেছে। পায়ের তলায় মড় মড় করছে শুকনো শালের পাতা। ঝড়ু মোড়লের সারা গা ভয়ে ছমছম করে উঠল।

—তারপরে ?

—তারপরে আর কী? সুন্দরলালের কণ্ঠে গর্বের আভাস লাগল: নাঙ্গা বাবা বললেন, যা ব্যাটা, তোর হয়ে গেছে। আজ থেকে সিদ্ধিলাভ করলি তুই। ভূত-পিরেত-পিশাচ-দানো তোর ছায়া দেখলেও ছুটে পালাতে পথ পাবে না।

দুপাশের বন জঙ্গলগুলি সন্ধ্যার সঙ্গে আরো ঘন ক'রে ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দরলালের মুখ দেখা যায় না, তবু ঝড়ু একবার সে মুখখানাকে দেখবার চেষ্টা করলে। এমন একটা লোকের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে, ভাবতেও সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

বনের পথটা পেরোতেই সামনে গ্রাম দেখা দিল। আকাশের এক কোণে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ এতক্ষণ কোথায় আত্মগোপন ক'রেছিল কে জানে! জঙ্গলের আড়ালটা কেটে যেতেই কাঁকর বিছানো পথটার ওপর তার আলো ঝিলমিল করে উঠল। সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের শব্দ। মহুয়ার গন্ধের সঙ্গে ওই শব্দটার চমৎকার একটা ছন্দোগত ঐক্য আছে বোধ হয়।

ঝড়ু সবিনয়ে বললে, একবার নাচ দেখতে যাবে না বাবাঠাকুর ?

—নাচ ? আচ্ছা, চল্।

দুদিকে মাটির দেওয়াল গাঁথা ছোট ছোট নীচু বাড়ি। মাঝখানে একটু-খানি ফাঁকা জায়গায় বসেছে নাচের আসর। কষ্টিপাথরের তৈরী কালো চেহারার দুজন পুরুষ দুলে দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে তালে ঝুঁকে ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে। পরস্পরের বাহুতে তারা আবদ্ধ, মুখে অস্ফুট গানের উচ্ছ্বাস। সে গানের ভাষা বোঝবার জো নেই, কিন্তু তার ধ্বনিটা একটা বিচিত্র গুঞ্জনের মতো বাজছে।

সুন্দরলালকে আসতে দেখে মাদল আর নাচ দুই-ই থেমে গেল। মেয়েদের কালো চোখে দেখা দিল কৌতুকের উজ্জ্বল আভা, পুরুষদের কণ্ঠে উঠল ভক্তিমুগ্ধ কলরব। কেউ কেউ উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে, কেউ বা আবার কোথা থেকে কাঠের একটা চৌপাই টেনে নিয়ে এল।

যথোচিত মর্যাদা আর গাম্ভীর্য নিয়ে চৌপাইটাতে আসীন হ'ল সুন্দরলাল। পুরুষেরা ঘিরে বসল তার চারপাশে। নাকের রূপোর আংটির ভেতর আঙুল দিয়ে মেয়েরা তাকিয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে।

সুন্দরলাল গম্ভীর হয়ে বললে, নাচ থামালি কেন ? চলুক না।

ঝড়ু মোড়লের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হয়ে উঠল : হাঁ হাঁ, নাচ চলুক। ভালো ক'রে নাচ দেখিয়ে দে বাবা ঠাকুরকে।

আবার মাদলে ঘা পড়ল। শাল বনের ওপর দিয়ে চাঁদ তখন অনেকখানি উঠে এসেছে। মেয়েদের উজ্জ্বল চোখগুলিতে, সুঠাম সম্পূর্ণ দেহশ্রীর ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়তে লাগল তরল লাবণ্যের মতো। সংসার-বিরক্ত সুন্দরলাল নিজের অজ্ঞাতেই খানিকটা সংসক্ত হয়ে উঠল হয়তো। হয়তো বা রক্তের এই চাঞ্চল্যটা পুরোপুরি দার্শনিকভাবেই অনুপ্রাণিত নয়।

দশ বারোটি মেয়ে এক সঙ্গে নাচছিল। তাদের ভেতর প্রায় প্রৌঢ়া

থেকে নিতান্ত বালিকা পর্যন্ত সব স্তরের মেয়েই আছে। তবে যুবতীর সংখ্যাই বেশি। অথবা অল্পেতেই এরা বুড়িয়ে যায় না ব'লেই হয়তো এদের যৌবন সব সময়ে বয়সের হাত ধরে চলে না। সুন্দরলালের সংসারাশ্রমের কথা মনে পড়ে। তার স্ত্রীর বয়স তো এখনো কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু—

চমক ভাঙল। এক ভাঁড় মহুয়ার মদ এসে গেছে। ঝড়ু বললে, পেসাদ ক'রে দাও বাবা ঠাকুর।

সুন্দরলাল আপত্তি করলে না। সন্ন্যাসের শেষ স্তরে উঠে সে নির্বেদ লাভ করেছে বলা চলে। মাটির পাত্রে ক'রে উগ্রগন্ধী মহুয়ার মদে গলা ভিজিয়ে নিলে সুন্দরলাল।

জ্যোৎস্নায় জোয়ার এসেছে ততক্ষণে। বাতাসে শাল ফুলের গন্ধ। এ দেশের লোক ও গন্ধটাকে স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে করে না, কিন্তু ওর সঙ্গে মহুয়ার তিক্ত মদিরতা মিশে গিয়ে আফিমের মতো একটা বিষাক্ত নেশায় যেন আচ্ছন্ন করছে চৈতন্যকে। কী কার্য কারণযোগে ওপাশের একটি তরুণী মেয়ের আন্দোলিত দেহবল্লরীর ওপর গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ল সুন্দরলালের দৃষ্টি। যেন মূর্ছিত হ'য়ে গেল বললেই ঠিক বলা হয়।

সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যপুষ্ট সম্পূর্ণতা। এমন মেয়ে এই অবাধ স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের দেশেও বিরল। সুন্দরলালের চোখ জ্বলতে লাগল।

—ওই মেয়েটা কে রে মোড়ল।

প্রশ্ন শুনে ঝড়ু সাঁওতাল কৃতার্থ হয়ে গেল যেন।

—ওই, ওর কথা বলছ? ওতো আমারি মেয়ে—বুধনী।

চাপকানের পকেটে হাত দিয়ে সুন্দরলাল টাকা পয়সাগুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে বৈরাগী, সে হিসাবে ধাতববস্তুর ওপরে তার যতটা অনাসক্তি থাকা উচিত তা নেই। সুন্দরলালের ভারী ভালো লাগে টাকা বাজানোর শব্দটা। ঠিক যেন গানের মতো কাণে বাজে।

—বুধনী? বাঃ বেশ নাম তো। ডাকতো ওকে।

বুধনী এগিয়ে এল। কতকটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতুক। ভয়ও যে একেবারে না আছে তা নয়। সুন্দরলাল হাত দেখতে পারে, ভূত ছাড়াতে পারে, আরো কত কী জানে ঠিক নেই। তার সামনে এসে দাঁড়াতে বুক যে খানিকটা দুর দুর করবেই—এই তো স্বাভাবিক।

কয়েক মুহূর্ত বুধনীর মুখের দিকে, স্তব্ধ হয়ে রইল সুন্দরলালের দৃষ্টি। গায়ের কাপড়টা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে সংযত হওয়ার চেষ্টা করলে বুধনী।

জামার পকেট থেকে দুটো টাকা বের ক'রে আনল সুন্দরলাল: এই নে, তোদের খেতে দিলুম। আর—আর—

মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। হয়তো মহুয়ার প্রভাবেই বিচিত্র রকমে গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর: তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী। তোর যে ভারী জোর বরাত। নাঙ্গা বাবার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে সহরে গিয়ে যে তোর কপাল ফিরে যাবে এ তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

সুন্দরলাল যেন দৈববাণী করছে। এ যেন সে নয়—যেন তার সত্তার ভেতর থেকে আর একজন কে আবির্ভূত হয়ে এল। সাঁওতালেরা জানে মাঝে মাঝে তার ওপরে ঠাকুর-দেবতার ভর হয়।

—চলে যা, চলে যা তুই। দেবতার নাম করে বলছি তুই চলে যা। সাড়ী, চুড়ি, তেল—যা চাস সব পাবি।

ভয়ে বিস্ময়ে সর্দারের চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বিস্ফারিত হয়ে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। দেবতার নামে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে সব। দেবতার একটি কুদৃষ্টিতে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যান্ত মানুষ মরে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে—গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। ভীত চঞ্চল সাঁওতালেরা চার পাশে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো, এই সুযোগে নিজেদের ভাগ্যটাকে একবার যাচাই ক'রে নিলে হয়।

—সহর! সাড়ী—চুড়ি—তেল! একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক। বুধনার চিন্তা আকস্মিকভাবে যেন খেই হারিয়ে ফেলছে।

সুন্দরলালের ওপর এখন পুরোপুরি ঠাকুরের আবির্ভাব। বুড়ো জেঠা টুডুকে সে বাতলে দিচ্ছে হাঁপানির ওষুধ। দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে নির্মল চাঁদের আলো অসীম প্রীতি আর বিশ্বাসের মতো ঝরে পড়ছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন রজনীগন্ধার অসংখ্য ছিন্ন পাপড়ি। মহুয়ার গন্ধে শালফুলের বিষাক্ত নিশ্বাস চাপা পড়ে গেল।……শুধু অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভুটানী খচ্চরটা। কী একটা অস্বস্তি অনুভব করে খট খট শব্দে সে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল।

খুব ভোরে ওঠা সুন্দরলালের অভ্যাস।

সূর্য সামনের পাহাড়টাকে ভালো করে রাঙিয়ে তোলার আগেই সে ঘরের বাইরে দড়ির খাটিয়ায় এসে বসে। তারপর হয়তো সুর করে তুলসীদাস পড়া সুরু হয় তার ঃ

“ঘটহ বঢ়হ বিরহিনী দুখ দাই
গ্রসহ রাহু নিজ সন্ধিহি পাই,
কোক শোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী,
অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহি—”

কিন্তু সীতার বিরহ নিয়ে বেশিক্ষণ সময় কাটাবার জো নেই। সাঁওতালেরা তাকে গুরু বলে মানতে সুরু করেছে আজকাল, সব কিছু কাজেই তার পরামর্শ ছাড়া এখন আর চলে না।

পাহাড় থেকে হরিণের পাল নেমে গম খেয়ে যাচ্ছে, তার কি প্রতীকার? বড়কা সাঁওতাল কি এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে, অথচ সমাজের আইনে তাদের বিয়ে হতে পারে না, এর কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? অমুকের পায়ের ঘা আজ তিন মাস ধরে সারছে না, কেউ কি তার কোনো অনিষ্ট করল?

এমন অনেক প্রশ্নের মীমাংসাই করতে হয় সুন্দরলালকে। কিন্তু নাঙ্গা বাবার আশীর্বাদের জোর আছে তার ওপরে। পশুপতিনাথের মন্দির থেকে লাভ করা সিদ্ধি—সহজ কথা নয়। তিরিশ বছর বয়েস পেরোনোর আগেই প্রাক্তন পুণ্যের বলে ইহলোক-পরলোকের সড়ক পাকা করে নিয়েছে সে।

আজো সকালে তিলক সাঁওতাল এসে দেখা দিলে।

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা ঠাকুর।

প্রকাণ্ড একটা ভাঙের গুলি মুখে পুরে দিয়ে সুন্দরলালের মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। "রামচরিত মানস" এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে,

তিলক সাঁওতাল গলার আওয়াজ নীচু করে আনল: তুমি বাণ মারতে জানো?

—বাণ?—একটা বিচিত্র হাসিতে সুন্দরলালের চোখমুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল: আমি বাণ মারতে জানিনে? আমি জানিনে তো কে জানে শুনি?

তিলক সাঁওতাল অপ্রতিভ হয়ে বললে, তাই বলছিলুম।

—তাই বলছিলি? তাই আবার কি বলবি? সেবার আসামের চা বাগানে এক সায়েবকে মেরে দিলুম না; তিনটা দিনও পেরোল না, মুখে রক্ত উঠে একেবারে—হুঁ হুঁ!

—কাবার হয়ে গেল?

—বিলকুল। খালি বাণ? ইচ্ছে হলে পিশাচ চালান করতে পারি।

তিলক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বাণ মারা—কী ভয়ানক। তুমি জানোও না—মাটিতে রেখা দিয়ে তোমার মূর্তি আঁকা হয়ে গেল, আর সেই মূর্তির বুকে মেরে দেওয়া হ'ল মন্ত্রঃপূত তীর। নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন ক্ষেতে কাজ ক'রে সন্ধ্যেবেলায় তুমি বাড়ি ফিরেছ, হঠাৎ অসহ্য ব্যথা উঠল তোমার বুকে। তারপর কাশির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফুসফুস দুটো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল—সাতটা দিনের ভেতরেই তুমি পুরোপুরি নিকাশ

হয়ে গেলে। আর পিশাচ! যে পিশাচসিদ্ধ, তার অসাধ্য কী আছে? এই সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে পাহাড়ে কত অশরীরী প্রেতাত্মা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় কে বলতে পারে? সন্ধ্যার কালো আবরণের তলায় যখন শালের বনগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন তাদের বড় বড় খসখসে পাতার মর্মরে সেই প্রেতাত্মারা নিশ্বাস ফেলে যায়। সে নিশ্বাস যার গায়ে লাগে, গোড়া কাটা লতার মতো শুকোতে শুকোতে একদিন শেষ আয়ুর বিন্দুটি অবধি তার মিলিয়ে যায়, বাষ্প হয়ে। যেদিন রাত্রে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঝড় ওঠে, মহুয়া গাছগুলো উপড়ে পড়ে, রাতচরা হরিণগুলো অবধি প্রাণের ভয়ে গমের ক্ষেতে নেমে আসে না—সে রাত্রিতে তারা উৎসব করে। সে-সময় যদি কেউ একবার ভুল করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে পরের দিন তার হাড় মাংসের একটি টুকরোও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত প্রেতাত্মা—এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পিশাচেরা সব সুন্দরলালের হাতধরা।

—কাকে মারতে হবে?

তিলক চমকে উঠল্। সুন্দরলাল হাসছে। হাসিটা মনোরম নয়—কী একটা অজ্ঞাত কারণে সমস্ত মনটাকে সংকুচিত, সন্ত্রস্ত করে আনে।

ব্যগ্র কণ্ঠে তিলক বললেঃ ও গাঁয়ের ডোমন মাঝিকে। কিছুদিন থেকেই আমার পিছে লেগেছে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবা ঠাকুর, ওর তুক মন্তরের চোটেই গত মাসে আমার ছেলেটা মরে গেল। তাগড়া জোয়ান ছেলেটা।—দেখতে দেখতে ছট্‌-ফটিয়ে মরে গেল।

তিলকের চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

—হুঁ! গম্ভীর হয়ে গেল সুন্দরলালঃ তোর কাজটা ক'রে দেব আমি—পিশাচ চালান দিয়ে দেব। পরশু শনিবার, কয়েকটা ফুল আর সিঁদুর নিয়ে আসবি, আমি তিনটে নরমুণ্ড জোগাড় ক'রে রাখব। তাই দিয়ে পিশাচ পূজো করতে হবে। তা হলে কী হবে জানিস?

তিলক ঘাড় নাড়ল।

তা হলে রোজ রাত্তিরে সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন প্রকাণ্ড একটা কালো পিশাচ এসে চেপে বসবে তার গায়ের ওপর। তারপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মতো ছুঁচালো ক'রে দিয়ে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ ক'রে রক্ত আর ঘীলু শুষে খাবে। তারপর—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে সুন্দরলাল হেসে উঠল। তার বলার ভঙ্গিতে এই সকালের আলোতেও তিলকের মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। দৃশ্যটা সে মনের সামনে কল্পনা করতে লাগল।

—যা মাঝি, পরশু আসিস। ফুল আর সিঁদুর যেন মনে থাকে। আর একটা কথা। এর পরে কিন্তু ক'দিন তোকে গাঁয়ের বাইরে আর কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। ডোমনের রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পিশাচটা আশে পাশে খুঁজে বেড়াবে তোকে। পেলে কিন্তু আর রক্ষা রাখবে না।

আর একবার তিলকের আপাদমস্তক নিদারুণ বিভীষিকায় চমকে উঠল।

তিলক চলে যাওয়ার পর সুন্দরলাল অনেকক্ষণ ব'সে রইল নীরবে। সামনে 'রামচরিত মানসে'র খোলা পাতাগুলো ফর ফর ক'রে উড়ে যাচ্ছে। উড়ন্ত একরাশ কালো কালো পলাতক হরফের মাঝখানে গন্ধমাদনধারী হনুমানের একখানা বীরমূর্তি পলকের জন্যে উঁকি মেরে গেল—রূঢ় খানিকটা রঙের প্রলেপ। দূরে মাঠের ওপর চরছে একদল মহিষ, দুটির গলায় বাঁশের বড় বড় চোঙ্গা বাঁধা। আর সব কিছুর ওপর দিয়েই সকালের রোদ প্রসন্ন একটা দীপ্তিমণ্ডলের মতো উদ্ভাসিত।

তত্ত্ব চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছে সুন্দরলালের মন। এমন ক'রে আর চলে না। দু'মাস—মাত্র দু'মাস সময়, অথচ এমন একটু একটু ক'রে এগোতে গেলে গোটা বছরই যে কাবার হয়ে যাবে। ওদিকে "সীজন টাইম" পেরিয়ে গেলে এ সবের কোনটারই কোনো অর্থ হয় না।

চেনা হাসির আকস্মিক একটা বন্যা শুধু কাণ নয়—সমস্ত মনের ওপরই যেন ভেঙ্গে আছড়ে পড়ল। নদীর ঢেউয়ের মতো উচ্ছলিত চটুলতায় রাঙা কাঁকরের পথ বয়ে একদল মেয়ে এগিয়ে আসছে। দিকে দিকে বসন্তের বিহ্বল মদিরতা,—আর তার মাঝখানে এরা যেন পরিপূর্ণ পানপাত্র। হাতের ছোট ছাট ঝাঁপিগুলি ভ'রে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়েছে, আর খোঁপায় জড়িয়েছে পত্রপল্লবে সমৃদ্ধ এক গুচ্ছ নাগকেশরের ফুল।

সুন্দরলালকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো মেয়েরা। নিজেদের ভেতরে কিছুক্ষণ কি সতর্ক আলোচনা চলল তাদের। সুন্দরলালকে তারা ভয় করে, কিন্তু তার চারদিক দিয়ে অতীন্দ্রিয় রহস্যের যে ঘন একটা কুয়াসা ঘেরা, তাদের কৌতুহলী মন মাঝে মাঝে সেই কুয়াসার ভেতরে প্রচ্ছন্ন জগৎটাকে আবিষ্কার করতে চায়।

বুধনী ইতস্তত করছে, কিছু যেন একটা বলবার আছে তার। অত্যন্ত বিপন্ন মুখে আঙুল দিয়ে গলার রূপোর হাঁসুলিটা খুঁটতে লাগল সে। একটি মেয়ে আলগাভাবে তাকে ধাক্কা দিলে—যেন তাদের সকলের কাছেই বুধনী কী একটা কৌতুক এবং কৌতুহলের বস্তু হয়ে উঠেছে।

সুন্দরলালের চোখে মুখে অতি-প্রকট তীক্ষ্ণতা :

কিরে বুধনী ?

কিন্তু বুধনীকে কিছু আর বলতে হল না। বাঁধ ভেঙ্গে উচ্ছ্বসিত কল তরঙ্গে যেন বেরিয়ে এল জোয়ারের জল। হাসির দোলায় মেয়েদের পরিপূর্ণ অপরূপ তনু সৌষ্ঠব ছন্দোময় হয়ে উঠল—সুন্দরলালের মনে হল : কামনার যেন শাণিত খানিকটা কালো আগুন দেহ-প্রদীপগুলিতে উঠলো শিখায়িত হয়ে।

—এত হাসছিস যে, সুন্দরলালের চোখ দুটো নির্লজ্জভাবেই ঘুরতে লাগল বুধনীর সর্বাঙ্গকে বিশ্লেষণ করে। এ দৃষ্টি হয়তো শরীরের কেবল বাইরেটাকেই দেখছে না, হয়তো তীক্ষ্ণ একটা সন্ধানী আলো ফেলে বুধনীর মনটাকেও দেখে ফিরছে। এ যোগীর দৃষ্টি—ভোগীর নয়।

বুধনীর সাহসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সুন্দরলালের দ্বিতীয় প্রশ্নে তাও যেন মিলিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে। মেয়েদের হাসি দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই রূপের প্রখর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে তারা পথের ওপর দিয়ে এক ঝলক দখিনা বাতাসের মতো বয়ে গেল। সুন্দরলাল হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়েই রইল।

দু'মাস মাত্র সময়—কিন্তু দু'টি দিন মাত্র বেশী দেরী হয়ে গেলে সত্যিই কি আর ক্ষতি হবে! বাগানে অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু বুধনীর জুড়ি নেই। সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরো সাপ উঁকি মারতে লাগল। সায়েব ভাল মানুষের কদর বোঝে দু'দিন বিলম্ব তার কাছে কিছুই নয়।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সুন্দরলাল যে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

সন্ন্যাসী মানুষ, ঘর ছেড়ে সেই কবে বেরিয়ে পড়েছে। বিষয় বাসনার কোনো প্রলোভনই নেই—সংসারে পরের উপকার ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। ঝড়ু সাঁওতাল একথা বিশ্বাস করে, বুধনীর সন্দেহমাত্র নেই, সুন্দরলালের মুখের দিকে তাকাতেও গা কেঁপে ওঠে তিলকের।

কিন্তু পশুপতিনাথের মন্দিরে পাওয়া সেই সিদ্ধ মন্ত্র। তার বলে কি না সম্ভব হয়। সুন্দরলাল টাকা তৈরী করতে পারে নিশ্চয়। কারো দরকার পড়লে অযাচিতভাবেই সে কাঁচা কর্‌করে টাকা বের ক'রে দেয় নতুন টাকা —ঝকঝকে টাকা। হয়তো অনেকটা এই কারণেই সাঁওতালেরা এত বেশি ক'রে তার কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করলে সে নাকি নুড়ি পাথরগুলোকে অবধি তাল তাল সোনা বানিয়ে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করলে কোন জবাব দেয় না—রহস্যময়ভাবে হাসে।

আরো কয়েকদিন পরে।

বিলি সাঁওতালনীর কি একটা মানসিক। শালবনের মাঝখানে সিঁদুর

মাখানো ওই যে বড় কালো পাথরটা—ওখানে শিং বোঙার পূজো। উপচার মুর্গী আর মহুয়ার মদ।

খচ্চরে চড়ে সুন্দরলাল এসে উপস্থিত হন।

তখন বলী শেষ হয়ে গেছে। পাথরটার চারপাশে ছিন্নকণ্ঠ মুর্গীর রক্ত। শালফুলের গন্ধে বাতাসটা কেমন ভারী—যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

মাদল বাজছে—তার সঙ্গে চলেছে নাচ। কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের মহুয়া মদির অসংযত নাচের দোলা এ নয়। সে নাচে রক্তে রক্তে একটা তরল নেশা ঘনিয়ে আসে, আর এ নাচ যেন মনের ওপর একটা অস্বস্তির আমেজ দেয়। পাহাড়ের কোল জুড়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে নিবিড়-নিবন্ধ শালের বন—বড় বড় পাতা স্তরে স্তরে সূর্যকে আড়াল করে সৃষ্টি করেছে প্রায়ান্ধকার একটা নিভৃত লোক। সেই নিভৃত লোকের মাঝখানে অশরীরী শিং বোঙা যে কোন মুহূর্তেই হয়তো বা দলবল নিয়ে সশরীরী হয়ে উঠতে পারে।

সুন্দরলাল আসতেই মদের পাত্র এগিয়ে এল। মহুয়ার সুরায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করে নিলে সুন্দরলাল। শিং-বোঙার কালো পাথরটার গায়ে রক্ত আর সিঁদুর লেপা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাথরটা যেন কার একখানা প্রসারিত মুখ—সত্যি সত্যিই যেন রক্ত খেয়েছে, যেন আরো রক্ত খাওয়ার জন্যে তাকিয়ে আছে তৃষ্ণার্ত চোখে।

সুন্দরলাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। একবার স্থির রক্ত চোখ মেলে তাকালো সকলের দিকে। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে সোজা পাথরটার সম্মুখে আছাড়ে পড়ল। পায়ে লোহার নালতোলা কাঁচা চামড়ার জুতা আর কুর্তার পকেটের টাকাগুলোয় মিলে উঠল একটা চকিত যুগ্মধ্বনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার উঠে দাঁড়াল সে। জামায় খানিকটা ধুলোর দাগ। একটু আগেই পান খেয়েছিল, মুখের দুপাশে খানিকটা

লাল রঙের গ্যাঁজলা বেরিয়ে রয়েছে বীভৎসভাবে। সকলের ওপর দিয়ে এক-বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ সে তাণ্ডব তালে নাচতে সুরু করে দিলে।

সোৎসাহে মাদল বেজে উঠল—ডুম ডুম করে উল্লাস জানালো নাগাড়া টিকরা। সুন্দরলালের ওপর ভর হয়েছে—শিং-বোঙার ভর। সাঁওতালদের চেতনার ওপর চাড়িয়ে পড়ল ভয় আর আনন্দের একটা বিচিত্র অনুভূতি।

হেলেদুলে সুন্দরলাল নাচতে লাগল। মুর্গীর খানিকটা রক্ত সে হাতে মুখে মেখে নিয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে পৈশাচিক বলে মনে হতে পারে। পায়ের কাঁচা চামড়ার জুতাটা দূরে ছিটকে পড়েছে—পকেটের টাকাগুলো সমান তালে বাজছে ঝন্ ঝন্ করে।

আকস্মিকভাবে সুন্দরলাল থেমে দাঁড়ালো।

অপ্রকৃতিস্থ চোখ দুটো যেন রক্তে ভিজিয়ে আনা। তার কণ্ঠে সেই দৈববাণীর সুর :

—ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস? আমি শিং-বোঙা, তোদের ডাকছি—শুনছিস?

আরো জোরে জোরে টিকারা বাজতে লাগল, আকাশ চিরে উঠল মাদলের শব্দ। সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। ঝড়ু সাঁওতাল কাঁপা গলায় বললে, কী হুকুম বাবা?

—আমার কথা শোন্। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে 'হয়জা'র মড়ক!—একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে' সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে তোদের ওপর—তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।

চম্‌কে মাদলের শব্দ থেমে গেল—হাত থেকে নাগাড়া টিকারা খসে পড়ল। শালফুলের গন্ধে বাতাসের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

সাঁওতালেরা হাহাকার ক'রে উঠল। মেয়েদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ভয়াতুর আর্তনাদ। এক সঙ্গে কলরব উঠল : কী উপায় হবে আমাদের বাবা ঠাকুর?

সুন্দরলালের কণ্ঠে দৈববাণীর সুর আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঝড় ওঠবার আগে থম্‌থমে কালো মেঘে আবৃত ঈশান দিগন্তের মতো তার মুখ :

—উপায় আছে। নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চলে' যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি।

আপত্তির ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলে ঝড়ু মোড়ল বললে, কিন্তু বাবা, ঘরবাড়ী সব ফেলে—

—ঘর বাড়ী, ঘর বাড়ী ! বিকৃত ভ্রূকুটিতে সুন্দরলালের রক্তমাখা কুটিল মুখখানা প্রেতের মতো দেখাতে লাগল : ঘরবাড়ী আঁকড়ে থেকে সব মরবি তা হলে। করম বাবা তোদের কাউকে আস্ত রাখবে ভেবেছিস! হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে—মনে রাখিস। কুকুর বেড়ালের মতো মরবি সব।

সুন্দরলালের চোখ দুটো রক্তে ভিজিয়ে আনা। সেই দুটো চোখের ভেতর সাঁওতালেরা যেন ভাবী মহামারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল।

বনবাস ছেড়ে আবার সংসারের দিকে ফিরতেই হ'ল সুন্দরলালকে। উপায় নেই। 'করম' দেবতার কোপ থেকে এই নিরীহ সাঁওতালদের তার রক্ষা করতেই হবে। আর বিপন্নকে উদ্ধার না করলে তার কিসের সন্ন্যাস।

সকালের আলোয় সাঁওতাল পরগণার বনশ্রী অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে বসন্ত যেন আনন্দের উল্লাসে তরঙ্গিত। ছোট ছোট গোলাপজামের মতো সাদা মহুয়ার ফুল তিক্ত মধুর রসে পরিপূর্ণ হয়ে টুপটুপ ক'রে খসে পড়ছে। ডালে ডালে সবুজের ছিট্ দেওয়া হরিয়ালের নাচ—ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক।

গলার সামনে গাঁটরি বাঁধা সুন্দরলালের ভুটিয়া খচ্চরটা টুক্‌টুক্ শব্দে ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। পেছনে মাদল বাজছে—একটা অস্ফুট গানের গুঞ্জন। সাঁওতাল পুরুষেরা ঘর ছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যেই কেউ হয়তো বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই।

পথ চলবার আনন্দে তারা লীলায়িত, মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে সাদা ফুলের মঞ্জরীগুলি দুলে উঠছে। বুধনীর চোখে স্বপ্ন সহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ী! দেবতার হুকুম পেয়েছে সে।......

......আসামের চা বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালা জ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে—আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল: বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওনা হয় কত!

সাঁওতাল পরগণার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা। সকালের হাওয়া লেগে পাহাড়ী পথের ওপর কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল।

হাড়

লোহার ফটকের ওপারে দুটো করাল দর্শন কুকুর। যে দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকাচ্ছিল সেটা বন্ধুত্ববাচক নয়। এক পা এগিয়ে আবার তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

ফটকের বাইরে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফিরে যাব? শ্যামবাজার থেকে এতদূরে পয়সা খরচ করে এসে দুটো কুকুরের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে যাব?

রায়বাহাদুর এইচ, এল, চ্যাটার্জি—ইন-ই তো বটে। কিন্তু ডাকি কাকে? দরোয়ানের ঘরটা বন্ধ। ওদিকে বাগানের একপাশে যেখানে চমৎকার গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুটেছে, একটা মালী ঝাঁজরি হাতে সেখানে কী যেন কাজ করছিল। আমাকে একবারও তার চোখে পড়েছিল কিনা জানিনা। না পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কী করি। চাকরীর উমেদার। বহু কষ্টে পরিচয়পত্র মিলেছে একখানা—পিতৃবন্ধু বলে একটা কথাও শুনেছিলাম। রায়বাহাদুর একটা কলমের খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরীটা। কাজেই এক সময়ে আমাকে দেখে হয়তো কারো কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠবে, আপাতত সেই শুভ মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করা যাক। গেটের সামনে পায়চারি স্থুরু করে দিলাম।

প্রসারিত রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। মোটর-ট্রাম-মানুষের অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা। মাথার ওপর এরোপ্লেনের পাখার শব্দ—জাপানী-দস্যুর আক্রমণ আশংকায় পাহারা দিচ্ছে। দি লায়ন হ্যাজ উইংস!

—গর্‌-র্‌-র্‌—

পেছনে ক্রুদ্ধ গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখি একটা মহাকায় কুকুর চলে এসেছে একেবারে গেট পর্যন্ত। আর লোহার রেলিঙের ভেতর দিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছে ভোঁতা সিক্ত নাকটা। চোখ দুটোতে সোনালি আগুন জ্বলজ্বল করছে—ঝকে উঠছে দুটো নতুন গিনির মতো। কয়েকটা হিংস্র দন্ত বিকাশ করে আবার বললে, গর্‌-র্‌-র্‌—

লক্ষণ সুবিধের নয়। 'শকটং পঞ্চহস্তেন'—শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় কুকুরের মহিমা টের পাননি তখনো। গেটের সামনে থেকে আরো দু পা দূরে এলাম। আশা ছাড়তে পারছিনা। উমেদারের আশা অনন্ত।

একটু দূরে মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয়—বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চীৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। সহানুভূতি আসেনা, বেদনা আসেনা, শুধু একটা অহেতুক আশংকায় মনটা শিউরে উঠে শিরশির করে। দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে—এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর এক খাবলা বাজরাই কি যথেষ্ট এর পক্ষে? আরো বেশি—আরো বেশি—এমন কি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়ীগুলো পর্যন্ত?

বাতাসে একটা গন্ধের তরঙ্গ এল। না, বুভুক্ষুদের নোংরা গন্ধ নয়, গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার উগ্রমধুর এক ঝলক সুরভি। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙীন কাচ দেওয়া জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড।

—কাকে চাই আপনার?

মিষ্টি মধুর কণ্ঠ—ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধের সঙ্গে যেন তার মিল আছে।

তাকিয়ে দেখি গেটের ওপারে কোথা থেকে একটি ষোড়শী এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দীর্ঘকায়া একটি গৌরাঙ্গী মেয়ে। ট্রাউজার পরা, সঙ্গে ছোট একটি সাইকেল। আবার প্রশ্ন হল : কী দরকার ?—এই চুপ !

গর্জন বন্ধ করে শান্ত হয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। মেয়েটির মুখের দিকে মুখ তুলে প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর মতো লুব্ধভাবে লেজ নাড়তে লাগল।

ভীত শুকনো গলায় বললুম, রায়বাহাদুর আছেন ?

—বাবা ? হাঁ আছেন বই কি।

—একটু দেখা করা সম্ভব হবে ?

—আসুন।

লোহার ফটক খুলে গেল। অ্যাসফল্টের রাস্তায় এবার বিস্তৃত আমন্ত্রণ। উজ্জ্বল মসৃণ পথ—আমার তালি দেওয়া জুতোটার চাইতে অনেক পরিষ্কার।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটু স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কী পড়ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

নমস্কার প্রতি নমস্কারের পালা শেষ হল। ভদ্রলোক বললেন, বসুন। কী দরকার ?

স্পন্দিত বুকে পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিয়ে আসন নিলাম।

রায়বাহাদুর খামখানা খুলে মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে আর আমি মাঝে মাঝে ভীরু দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভারী গোল একখানা মুখ—টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে যেন রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাড-প্রেশার কথাটার ডাক্তারী সংজ্ঞা জানিনা, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড্-প্রেশারে ভুগছেন !

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। কোথায় একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। হাওয়ায়

উড়ছে রায়বাহাদুরের কিমানোর হাতাটা। বাঁ হাতের অনামিকায় অমন জ্বলজ্বল করছে কী ওটা? হীরাই নিশ্চয়।

চিঠি পড়া শেষ করে রায়বাহাদুর আমার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি শান্ত আর উদার। অবচেতন মন থেকে কেমন একটা আশ্বাস যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো হয়েও যেতে পারে চাকরীটা।

—প্রমথর ছেলে তুমি? আরে তা হলে তো তুমি আমার নিজের লোক। তোমার বাবা আর আমি—ফরিদপুরে ঈশান ইস্কুলে একসঙ্গেই পড়েছিলাম। প্রমথ? ও, হি ওয়াজ্ এ নাইস্ বয়!

আমি বিনয়ে মাথা নত করে রইলাম।

—তোমার বাবা যখন রেজিগ্‌নেশন দেয়, সে খবর আমি পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ও খুব স্পিরিটেড্, অন্যায় কখনও সইতে পারত না। নইলে এত সহজে অমন চাকরী ছেড়ে দিলে। অ্যান্ এক্সসেপসনাল বয় হি ওয়াজ্!

নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর কী করা যায়। পিতৃ-প্রশংসায় বিনীত হয়ে থাকাই উচিত ভক্ত সন্তানের।

—তারপর, চাকরী পাচ্ছনা যুদ্ধের বাজারে? এম-এ পাশ করে কেরাণী-গিরির উমেদারী করছ? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেণ্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে। চাকরী নাও অ্যাকৃটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।

বললাম, নানারকম অসুবিধে আছে, অনেককে দেখা শোনা করতে হয়। তা ছাড়া একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে—

—অনিশ্চিত!—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়বাহাদুরের দৃষ্টি: জীবনটাই তো অনিশ্চিত হে ছোকরা। আমিও একদিন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে। সিঙ্গাপুরে কাটিয়েছি দশ বৎসর, ভেসে গেছি হাওয়াই, ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন, মিকাদোর দেশে জাপানে। পৃথিবীটাকে চোখ মেলে না দেখলে বাঁচবার অর্থ নেই কোনো।

—তা বটে।—আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলাম। রায়বাহাদুরের কথাগুলো ভালো, অত্যন্ত মূল্যবান। অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই বলেই তো বাঙালীর সমস্ত প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ভালো কথা জানলেই কি ভালো হওয়া যায়? যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোট বিঘ্নিত ফেনিল সমুদ্রে নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাকে কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। তা ছাড়া পৈতৃক অর্থে প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়ানো, আর বোমারু ঈগলের মৃত্যু-চঞ্চুর তলায় দূরবীণের শাণিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রতীক্ষা করা—আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, কত জায়গাতে ঘুরেছি আমি। হাওয়াইয়ের সেই হুলাহুলা ড্যান্স, স্টিভেনশন ব্যালেণ্টাইনের প্রবাল-দ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা। বিচিত্র সব কালেক্‌শান আমার, দেখবে?

কালেকশান দেখবার মতো মনের অবস্থা নয়। পঁচিশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশন আছে একটা, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পিতৃ-বন্ধু রায়বাহাদুরকে চটানো চলে না, তাঁর কলমের একটা আঁচড়েই হয়ে যেতে পারে চাকরীটা।

উঠে জোরালো একটা ইলেক্‌ট্রিকের আলো জাললেন রায়বাহাদুর। তারপর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী খুললেন তিনি। তার ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে এল কালো ভেল্‌ভেটের একটা বাক্স, সেটা এনে রাখলেন আমার সামনে। ঢাকনাটা খুলে বললেন, দেখেছ?

দেখলাম, কিন্তু একী কালেকশন! কতগুলো ছোট বড় হাড়ের টুকরো। প্রত্যেকটার সঙ্গে একখানি করে নম্বরের ছোট লেবেল ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, হাড় নাকি এগুলো?

—হাঁ, হাড় বই কি।—আমার মুখোমুখি হয়ে বসলেন রায়বাহাদুর : কিন্তু সাধারণ হাড় নয়। এদের প্রত্যেকের বিস্তৃত পরিচয় আছে, অমানুষিক সব গুণ আছে। সমস্ত প্যাসিফিক ঘুরে আমি এদের সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওয়ান মিনিট প্লীজ—সুষি মাদার ?

সুষি ঘরে ঢুকল। সেই মেয়েটি।

—ডাকছ বাপী ?

—আমাদের চা—

—বলছি এখুনি—নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত তনু দেহটিতে একটা দোলা দিয়ে সুষি বেরিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর আবার আমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন ! তারপর দামী দুর্লভ একখণ্ড হীরার মতো পরম যত্নে একটুকরো হাড় তুলে আনলেন বাক্স থেকে।

—বলতে পারো, কিসের হাড় এটা ?

নিশ্চয়ই ভয়ানক একটা কিছুর। ভয়ে ভয়ে বললাম, গরিলা ?

নন্‌সেন্স্ !—রায়বাহাদুর প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন আমাকে : প্রশান্ত মহাসাগরে গরিলা থাকে শুনেছ কখনো ? এটা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় কোনো আদি-মানবের চোয়ালের হাড়।

—রোডেশিয়ান ?

—হাঁ, রোডেশিয়ান।—রায়বাহাদুর স্পষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন : রোডেশিয়ানের নাম জানোনা ? অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক গরিলা, মাত্র কয়েক শো বছর আগেও পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল তাদের।

বোকার মতো বললাম, আজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি।—অবচেতন মনের কাছে স্বরটা যেন বাজলো মোসাহেবীর মতো। কিন্তু উমেদারী করতে হলে মোসাহেবী তো অপরিহার্য।

—এটা সেই রোডেশিয়ান ক্লাশের কোনো জীবের হাড়—মানুষেরও

বলতে পারো। কোথায় পেয়েছি জানো? মিণ্ডানাও দ্বীপে কাটাবাটু বলে জায়গা আছে একটা। তারই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের সর্দারের কাছ থেকে এই হাড় আমি কিনেছিলাম। কত দাম দিয়ে কিনেছিলাম বলতে পারবে?

ধমক খাওয়ার ভয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে সাহস হলনা। বললাম, অনেক দাম হবে নিশ্চয়।

—নিশ্চয়। পাঁচ হাজার টাকা।

—পাঁ—চ হাজার টাকা!—রায়বাহাদুরের হাতের তেলোয় ওই বস্তুটির দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চ্যাপটা আকৃতির, অনেকটা ছুরির ফলার মতো দেখতে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় হরিদ্রাভ রং ধরেছে, রায়বাহাদুরের বিকটকায় কুকুরগুলোর নোংরা দাঁতের মতো।

—খুব বেশি মনে হচ্ছে? মোটেই নয়। এর ইতিহাস শুনলে তুমি—

দূর থেকে একটা তীব্র কোলাহলে বাকী কথাগুলো উড়ে গেল মুহূর্তে। বাইরের পথে ট্রামের শব্দ, ঘরের ঘড়িটার টিকটিক করে ছন্দোবদ্ধ স্বর ঝঙ্কার—সব কিছুকে ছাড়িয়ে সেই কোলাহল কানে এসে আঘাত করে। কিন্তু কলরবটা অপরিচিত নয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে ক্ষুধার্ত জনতার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুরের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল: পার্কের ওই ডেস্‌টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধ হয় খাবার-দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চীৎকার। খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।

সবুজ পর্দা সরিয়ে একটা ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চা, খাবার। পিতৃদেবের বন্ধুত্বটা রায়বাহাদুর সত্যি সত্যিই মনে করে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। এ যাত্রা বোধ হয় হয়েই যাবে চাকরীটা।

রায়বাহাদুর বললেন, নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট কাছে টেনে নিলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে বিলক্ষণ। বেলা এগারোটায় মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, বেলা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে এখন। এর মধ্যে এক কাপ চা খাইনি, একটা সিগারেট পর্যন্ত নয়।

দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চীৎকার। ডাষ্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সচীৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ স্বরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্রভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোণে কেক্ কাটছি— উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীষ চিবানোর মতো দাঁতের একটুখানি বিলাসিতা মাত্র। চায়ের কাপে এমনভাবে চুমুক দিচ্ছি যে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না—ঠোঁটের আগায় আল্‌গাভাবে চুম্বনের মতো একটু ছোঁয়াচ লাগছে। গপ্‌গপ্‌ করে গেলা, হুস্ হাস্ করে শব্দ করা—জীবনের সমস্ত এস্‌থেটিক আনন্দ তাতে বিস্বাদ হয়ে যায়। খাওয়াটা যেমন স্থূল, তেমনি গ্রাম্য হয়ে ওঠে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, হাঁ, কী বলছিলাম? এই হাড়খানা। বড় বিচিত্রভাবে সংগ্রহ করেছিলাম এটাকে। ওখানকার সর্দার এখানাকে পরত মুকুটে। কারণ যার মাথায় এই হাড় থাকবে সে হবে যুদ্ধে অজেয়—শত্রুর হাজার অস্ত্রাঘাতও তার কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা। ওদের কোন এক যাদুকর পুরোহিত একে মন্ত্র সিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে আমি এটাকে যোগাড় করি, কিউরিয়োর অপূর্ব নমুনা হিসেবে। ওয়েল ইয়াং ম্যান, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করো তুমি?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। মনোহরপুকুর পার্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন চীৎকার। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করি বই কি। শস্যশ্যামল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

বাংলা—হরিবর্মদেব, শশাঙ্ক-নরেন্দ্রের তলোয়ার ঝলসিত বাংলা। কার মন্ত্রবলে সেই বাংলা থেকে উঠে এল এই প্রেতের দল? মাঠভরা ফসল কার মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি কণাও পড়ে রইলনা কোনখানে? যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস না করে উপায় কী।

বললাম, হাঁ, ইয়ে—কত রকম ব্যাপারই তো আছে, বিজ্ঞান দিয়ে তার—

—দেয়ার ইউ আর—দু' নম্বরের হাড়খানা হাতে তুলে রায়বাহাদুর বললেন, আমিও সেই কথাই বলছি। স্টিভেনশনের সেইসব গল্পগুলো পড়োনি? দেখতে দেখতে একটা সাধারণ মানুষ সাড়ে তিন শো হাত লম্বা হয়ে ওঠে, বড় বড় পা ফেলে পার হয়ে যায় সমুদ্র, আর জলের তলায় নিমজ্জিত সব নাবিকদের কঙ্কালগুলো সেই অতিকায় পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যায় মড় মড় করে? তাহিতির আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ রক্তের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্কা বয়ে যায়, আকাশ থেকে যে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে, তা জল নয়, টকটকে তাজা রক্তের ফোঁটা। আর কেমন করে হয় জানো? এইরকম—ঠিক এমনি একখানা হাড়ের গুণে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমি সেই হাড়ের দিকে তাকালাম। অন্য সময় হলে এসব কথা গঞ্জিকার মহিমা-প্রসূত মনে হত কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন এই সমস্ত কাহিনীর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা আর রায়বাহাদুরের পাইপ থেকে কড়া তামাকের গন্ধ। হাওয়ায় জানালার নীল পর্দাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তরঙ্গ-মালার মতো দোল খাচ্ছে। রায়বাহাদুরকে মনে হল যেন অপরিচিত দেশের সেই অদ্ভুতকর্মা যাদুকর—তাঁর হাতের হাড়ে মুহূর্তে ভেল্‌কি লাগতে পারে।

—পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পুজো করে কুমারী মেয়েকে বলি দেয় ওরা। তারপর তাকে পুড়িয়ে হাড়গুলো যা থাকে তা মাটির তলায় পুঁতে দেয়।

সাত বছর পরে মহাসমারোহে সে হাড় তুলে আনা হয়, ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। সে হাড় যে জলের তলা থেকে তুলে আনতে পারে সেই হয় এই যাদুবিদ্যার মালিক। যত প্রেতাত্মা সব তার অনুচর হয় তখন, সে যা খুশি তাই করতে পারে। তাল তাল পাথর তার ক্ষমতায় সোনা হয়ে যায়, তার আদেশে লতা-পাতাগুলো অজগর সাপ হয়ে ফণা তুলতে পারে—

আমি বসে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। রায়বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলছে, হাতের হীরাটা জ্বলছে, জ্বলছে বলি-দেওয়া সেই কুমারী মেয়ের হাড়খানা, নীল পর্দাগুলো জ্বলছে, আগুনের মতো জ্বলছে অতি তীব্র শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা। সমস্ত ঘরটা যেন জ্বলন্ত। আর সেই জ্বলন্ত ঘরের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ, পাইপের তামাকের গন্ধ, ভেলভেটের বাক্স থেকে উঠে আসা কী একটা ঔষধ-গন্ধ। মনে হল যেন আমার সামনে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, তার লকলকে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে একতাল কাঁচা মাংস—তামাটে ধোঁয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দগ্ধ মেদ আর চুলের অত্যুগ্র দুর্গন্ধ—যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

—চাট্টি ভাত দাও মা—একটুখানি ফ্যান—

মোহ ভেঙে গেল মুহূর্তে। তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়। বুভুক্ষার লেলিহান শিখায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে বিরাম নেই ট্রাফিকের। ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, চলছে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা'। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ওই চীৎকার এসে ঘা দিচ্ছে কানে। কী অস্বাভাবিক গলার জোর, কী দানবীয় আর্তনাদ! মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওই রকম গগনভেদী হয়ে ওঠে!

রায়বাহাদুর আবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন বিরক্তিতে। শব্দটা তারও কানে এসেছে। বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্ত ভুলে যাওয়ার জো নেই, তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোথায় তাহিতি-ম্যানিলা-হনোলুলুর যাদু-রাজ্য, আর কোথায়—

কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল তাঁর দরজায় দুটো করালদর্শন এবং করাল দশন কুকুর। নতুন গিনির মতো ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ মেলে তারা পাহারা দিচ্ছে, কোনো অনাহূত রবাহূতের সাধ্য নেই তাদের সতর্ক প্রহরী এড়িয়ে এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে। এ যাদুমন্ত্রের দেশ। বাইরের পৃথিবীতে যত ক্ষুধাই উত্তাল হয়ে উঠুক না কেন, এখানকার ফুলের গন্ধ, রায়বাহাদুরের হাতের জ্বলজ্বলে হীরাখানা অথবা নীল পর্দার গায়ে বিদ্যুতের আলো— কোনোখানে তার এতটুকুও বৈলক্ষণ্য দেখা দেবে না।

—এই হাড়গুলো আমার বহু যত্নের কালেকশন। অনেক আছে, প্রত্যেকটারই এইরকম সমস্ত গুণ। প্যাসিফিক ঘুরবার সময় এগুলো সংগ্রহ করাই 'হবি' ছিল আমার। ভাবছি এই নিয়ে বই লিখব একখানা।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কেবলই মনে হচ্ছে একটা অমানুষিক গন্ধ আসছে নাকে, আগুনের গন্ধ, পোড়া মাংসের গন্ধ। পালাতে পারলে যেন বেঁচে যাই। কিন্তু চাকরীটা! রায়বাহাদুরের কলমের এক আঁচড়, মাত্র একটি আঁচড়েই সেটা হয়ে যেতে পারে।

—হাড় জোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্রগুলো পাইনি। সেগুলো অনধিকারীকে শেখায় না ওরা। যদি পাওয়া যেত—রায়বাহাদুর হাসলেন—যদি পাওয়া যেত তা হলে এতদিনে কত কী অঘটন ঘটিয়ে বসতাম কে জানে। হয়তো সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই বদলে যেত মন্ত্রবলে। আর এই যে ছোট্ট দাঁতটা দেখছ, এটা—

অস্থিরাজ্য থেকে যখন মুক্তি পেলাম, রাত তখন নটার কাছাকাছি।

উপসংহারে রায়বাহাদুর বললেন, ইয়াং ম্যান, কেন পঞ্চাশ ষাট টাকার চাকরীর জন্য ঘোরাঘুরি করছ? বী কারেজিয়াস্! ভাগ্যের সন্ধ্যানে বেরিয়ে পড়ো, নাম লেখাও অ্যাক্‌টিভ্ সার্ভিসে! সামনে পড়ে রয়েছে সমুদ্র, পড়ে রয়েছে পৃথিবী। কেরাণীগিরি করে কী হবে?—

ক্লান্ত নিরাশ গলায় বললাম, তা বটে, কিন্তু চাকরীটা পেলে—

—ওই চাকরী চাকরী করেই উচ্ছন্ন গেল দেশটা।—রায়বাহাদুর উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন : তুমি প্রমথর ছেলে। তোমার বাবা, হোয়াট এ স্প্লেন্‌ডিড বয় হি ওয়াজ ! বাপের নাম রাখতে হবে তোমাকে। একটা নগণ্য কলম-পেশার চাকরীর মধ্যে নিজের সমস্ত ফিউচারকে নষ্ট করে দিয়োনা। আই উইস ইউ অল সাক্‌সেস্ ইন্ লাইফ। আচ্ছা, গুড্ নাইট—

—নমস্কার—

ব্ল্যাক-আউটের আলোহীন পথ। উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করে ভারী পায়ে চললাম এগিয়ে। ট্যুশনিতে আজ আর যাওয়া হলনা। ছাত্রের বাবা মহাজন লোক, পাই পয়সা বাজে খরচ করেন না। একদিনের মাইনে কেটে নেওয়া বিচিত্র নয়।

সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভেতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি—নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেট-ওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু' হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড় ? হাঁ, হাড়ই তো।

আমি থমকে থেমে দাঁড়ালাম। কোথায় একটা সাদৃশ্য বোধ—সেই বলি-দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়খানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরাক্ত মেঘ ভেসে ওঠে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝাপটা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না ? ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ-জড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক লক্‌লক্ করে বয়ে যাবে কবে ?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।

নীলা

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মানচিত্রটা খুলে ভাস্করের চোখে পড়েছিল উত্তর থেকে পূর্ব বাংলার বুক অবধি পৈতের মতো টানা রেখায় 'সুগার কেন' লাইন। আর উত্তর বাংলার এই সীতাগঞ্জ জায়গাটা তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আখ মাড়াইয়ের পর্ব শেষ হলেই দশমনী কড়াইতে গুড় জ্বাল সুরু হয় চারিদিকে আর সারা বছর সেই গুড় চালান হয় বাংলার নানা অঞ্চলে। শুধু পরিমাণই নয়, উৎকর্ষের দিক থেকেও এখানকার গুড়ের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওপরটায় সুগন্ধি মধুর মতো তরলাংশ ভাসতে থাকে, তার তলায় মিছরির মতো দানাদার গুড় জমাট বাঁধে। রসটা শুকিয়ে নিলে সে গুড় জাভা চিনির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়।

মারোয়াড়ী ফিনান্সার প্রস্তাবটা শুনে লাফিয়ে উঠল। ভাস্করের ওপরে তার অখণ্ড বিশ্বাস। সারা ভারতবর্ষে তার মস্তবড় কারবার, ধানের কল, পাটের কল, আমেদাবাদের এজেন্ট। মানুষ চিনতে তার ভুল হয় না। বললে বেশ তো, চটপট জমি ইজারা নিয়ে 'মিসিন' বসিয়ে দিন। আপনাকেই আমি ম্যানেজার করে পাঠাব।

অতএব একদিন কলকাতা থেকে সমস্ত বন্দোবস্ত করে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে রওনা হল ভাস্কর। জেলা স্টেশনের জংশনে গাড়ী বদল করে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণে দু'ঘণ্টা মন্থর যাত্রা শেষ করে অত্যন্ত নগণ্য একটা স্টেশনে এসে সে নামল। দিন সাতেক ডাক বাংলোয় কাটিয়ে গোরুর গাড়ী আর সাইকেলে ছুটোছুটি করে আর তাড়ায় তাড়ায় নোট বিলিয়ে সব ঠিক হয়ে গেল। সাইডিঙে তিন চারটে লাইন বেরিয়ে গেল মিলের সাইট পর্যন্ত, এল ওয়াগন বোঝাই লোহা লক্কড় আর যন্ত্রপাতি, এল ক্রেন্। তারপর দেখতে

দেখতে বিশাল চিনির কলের বিরাট লৌহমূর্তি উঠল আকাশের বুক বিদীর্ণ করে, বয়লারে জ্বলতে লাগলো আগুন। চেনে, চাকায়, স্ক্রু আর বল্টুতে, স্টিম ফার্নেসে, সীতাগঞ্জ আর মতিহারীর গাড়ী গাড়ী আখ হাজার হাজার মণ চিনিতে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল তার শুভ্রতা, ইলেকট্রিকের আলোয় একরাশ মুক্তো চূর্ণের মতো সে চিনি ঝলমল করতে লাগল।

ম্যানেজার ভাস্কর কিন্তু বাঙালী নয়। জাতে সে মাদ্রাজী, তার পুরো নাম ভাস্কর নটরাজন্।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র সে, স্ট্যাটিস্‌টিক্সে তার রেকর্ড। হীরালাল নাথমলের ফার্মে ঢুকেছিল মাঝারী গোছের একটা চাকরী নিয়ে। কিন্তু কয়েক বছর পরে মালিকের নেক নজর তার ওপর এসে পড়ল। তারপর থেকেই নিরবিচ্ছিন্ন আরোহণের ইতিহাস এবং পরিশেষে বারোশো টাকা মাইনেতে এল সীতাগঞ্জ হীরালাল সুগার মিলের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে।

ফাঁকা মাঠটা ইন্দ্রপুরী হয়ে গেছে। ইলেকট্রিকের আলো, বাবুদের কোয়ার্টার, কুলীদের শেড! পীচের রাস্তাটা মোটরের তেলে আরো চক্‌চকে যেন ইস্পাতের পাতের মতো জ্বলে উঠছে। লরী, ওয়াগন আর ট্রলীর সমারোহ।

সন্ধ্যার পরে কোয়ার্টারের দোতলায় একগাদা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে বসেছিল ভাস্কর। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল একজন পার্সোনাল সেক্রেটারীর। অ্যাপ্লাই উইথ ফটো। বলা বাহুল্য, মহিলা সেক্রেটারীই তার দরকার।

মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে পাখা। বিদ্যুতের আলোয় সে পাখাটার বিচিত্র চলচ্ছায়া ঘরময় খেলা করছে, মনে হচ্ছে কোথায় যেন উড়ছে প্রায় অশরীরী একটা বিরাট পতঙ্গ। ঠোঁটের কোণে পুড়ছে কড়া সিগার।

দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলো, দুটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাড়া সবই বাঙালী মেয়ে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দরখাস্ত সে অযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওই সম্প্রদায়ের মেয়েদের ওপরে তার একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে আর বাঙালী মেয়েদের প্রতি আছে একটা স্বাভাবিক লোলুপতা আর কৌতূহল।

একরাশ ফটো। চকচকে উজ্জ্বল চোখ, তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমন্ত চোখ। কোনোটা প্রগলভ হাসিতে মুখর, কোনোটা নির্বোধ ভীতিতে নীরব। ভাস্কর লোভীর মতো তাকিয়ে রইলো। মোগল বাদ্‌শাদের মতো যদি এ যুগেও হারেমের বন্দোবস্ত করা যেত, তা হলে এদের সবগুলিকে এনেই জড়ো করত এক সঙ্গে।

কাকে ছেড়ে কাকে নেওয়া যায়। মনে পড়ল মাদ্রাজের ছাত্রজীবনের কথা। খবরের কাগজে বেরোতো বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে সব বিস্ময়কর সংবাদ। তাদের উজ্জ্বল কালো চোখে বাংলার শ্যামশ্রীর মেদুরতাই শুধু ছায়া ঘনিয়ে তোলে না, তাদের হাতের পিস্তল থেকে ঝাঁঝাঁলো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে সব খবর পড়তে পড়তে চমকে উঠতো বুকের রক্ত, ঝম ঝম করে উঠতো শরীর। মনের সামনে কল্পজগতের যে সমস্ত মায়ামূর্তি দেখা দিত তাদের কাছে মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যেত কঠিন চেহারার মাদ্রাজী মেয়েরা। আগ্নেয় শিলার মাটিতে পূর্বঘাট পাহাড়ের ছায়ায় যারা পূজো দিতে যায় মন্দিরে, সুদূর গঙ্গার পলিমাটিতে কোমল শান্ত বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে তাদের মনে হত খেলার পুতুল।

তারপর ভাস্কর এল কল্‌কাতায়। বাঙালী বীরাঙ্গনাদের দেখা মিলল না বটে কিন্তু মোহ গেল না। ট্যাগোরের দেশে। 'রেড্ অলিণ্ডার্সের' নন্দিনীকে এখানে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে! 'লাভার্স গিফট আর ক্রসিং'-এ যাদের কালো হরিণ চোখ তাকে আকুল করে দিয়েছিল তারা কি এই?

ব্যবসা ও টুকিটাকি প্রয়োজনের খাতিরে মেয়েদের সংস্রবে আসতে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ ভাস্কর কখনও পায়নি।

অথচ ট্রামে বাসে যখন দুটি ছেলে মেয়ে পাশাপাশি বসে আলাপ করেছে, তখন কি একটা তীব্র অস্বস্তিবোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন। বিলাতী সিনেমায় প্রজাপতির মতো রঙীন হয়ে দল বেঁধে এসেছে বাঙালীর মেয়েরা, ছবি দেখার চাইতে চকোলেট আর আইসক্রীম খেয়েছে বেশি আর ভাস্কর অভদ্র বিস্ফারিত চোখ মেলে যেন তাদের গিলে ফেলতে চেয়েছে।

এতদিনে মিলেছে সুযোগ। ফটোগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ছবিতে এসে দৃষ্টি নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে একটি মেয়ে। স্নিগ্ধ চোখ দুটি যেন লাবণ্যে ঢলঢল করছে। সমস্ত মুখে একটা অদ্ভুত করুণতা—এ শুধু বাঙালী মেয়েতেই সম্ভব, এই ট্যাগোরের দেশে, এই সবুজ ধান আর পদ্মার দেশে।

ভাস্করের মুখ দিয়ে বেরোলো—ইউনিক!

পরিচয়টা তলাতেই লেখা আছে। সবুজ কালীতে, সুঠাম বড় বড় হরফে। কুন্তলা রায়, অর্থনীতির অনার্স গ্রাজুয়েট।

কয়েক মুহূর্ত সে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ছবি আর হাতের লেখায় অপূর্ব সুর বাঁধা, যেন মেয়েটির সমস্ত পরিচয় স্পষ্টতর করে তুলেছে। নিবে যাওয়া চুরুটটাতে আর একবার মুখাগ্নি করলে, তারপর একটা প্যাড টেনে নিয়ে খস খস করে লিখতে সুরু করলেঃ ডিয়ার ম্যাডাম, আই অ্যাম গ্ল্যাড টু ইন্‌ফর্ম ইউ—

ভোরের অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই মিলের লোহালক্কড়গুলো আর্তনাদ সুরু করে দেয়। চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হয় আকাশের দিকে। নিষ্পিষ্ট ইক্ষুস্তূপ থেকে ট্যাঙ্কে রস গড়িয়ে পড়ে, আর সেই রস যায় ভ্যাকুয়াম প্যানে, ষ্টিমে জ্বাল হয়ে বেরিয়ে আসে ধব্‌ধবে সাদা চিনি। বছরে ছমাস কাজ চলে পূর্ণোদ্যমে, তারপর অফ্‌ সীজন। মিলের কাজ বন্ধ থাকলেও ওয়াগন বোঝাই চিনি নিয়মিত চালান যায় কলকাতার বাজারে।

কুন্তলা রায় এসে যোগ দিয়েছে ভাস্করের পার্সোনাল সেক্রেটারী হয়ে।

একটা চিঠি ডিক্টেট করে চলেছে ভাস্কর আর কুন্তলার টাইপ রাইটার প্রতিধ্বনি তুলছে খটাখট শব্দে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর টাইপ-রাইটারে চোখ রেখে কুন্তলা বললে, ইয়েস্! তারপর!

—তারপর? তারপর?—ভাস্কর কথাটা যেন নিজের মনের মধ্যেই গুঞ্জন করতে লাগল। আস্তে আস্তে জবাব দিলে, থাক!

বিস্মিত চোখ তুলে কুন্তলা তাকাল ভাস্করের মুখের দিকে। ভাস্করের নির্নিমেষ চোখ দুটোও তারি ওপরে নিবদ্ধ। যেমন মুগ্ধ তেমনি মুখর। কুন্তলার কপালে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল।

—কী চমৎকার সকাল মিস রায়। শুধু কাজ করে এমন সকালটা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। একটা রাইডে আপত্তি আছে তোমার?

—রাইড? কিন্তু চিঠিটা যে জরুরী, আজকের ডাকে—

—জরুরী?—ভাস্কর যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল: বিচার করতে গেলে মানুষের প্রত্যেকটি মুহূর্তই জরুরী মিস রায়। সময়কে অত হিসেব করে খরচ করতে গেলে বাঁচাটা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

টাইপ-রাইটারের ওপর কনুই রেখে বক্র গ্রীবায় এবং উজ্জ্বল কটাক্ষে ভাস্করকে লক্ষ্য করতে লাগল কুন্তলা। শ্যামবর্ণ খর্ব চেহারা, অতিরিক্ত প্রশান্ত কপালটাতে চন্দনের তিলক-চিহ্ন। প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটের কোণ দুটো চাপা আর দৃঢ়-সম্বদ্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞার কঠোরতায় মণ্ডিত। টেবিলের ওপরে রাখা কালো হাতের কব্জির হাড়টা অস্বাভাবিক চওড়া, ছোট ছোট মোটা আঙুলগুলো বাস্তবতার দ্যোতক।

অথচ ভাস্করের কণ্ঠে যা প্রকাশ পেল, তার চেহারার সাথে সে সুরের মিল নেই। একটা নিবিষ্ট আবেশ। মাদ্রাজের আগ্নেয়শিলা বাংলার পলি-মাটির মতো কোমল আর শ্যামল হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর বললে চলুন মিস্ রায়। চমৎকার মোটরের রাস্তা আছে,

গ্রামের ভেতর থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। ফিরে এসে চিঠিটা শেষ করলেই চলবে।

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলল, চলুন।

বাইরে আকাশ-গলা শরতের রোদ। মিলের লৌহ-কঠিন দেহটা যেন সোনায় স্নান করছে। যন্ত্রের কলরব উঠছে আকাশে, নীরব হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে হাল্‌কা মেঘ ভেসে বেড়ানো নিঃসীম নীলিমতায়। বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলছে আগুন। কিন্তু আকাশ থেকে আজ আর দেবতার অভিশাপ নেমে আসছে না, একরাশ ঝরা শেফালীর মতো মুঠো মুঠো সোনালী রোদে যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল ভাস্করের ঝকঝকে পণ্টিয়াক। নতুন মডেলের আমেরিকান গাড়ী, পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী। সোফারের সীটে বসে ভাস্কর পাশের দরজাটা খুলে দিলে। বললে, এস।

কুন্তলা ইতস্তত করলে এক মুহূর্ত : আমি বরং পিছনের সীটে—

পরক্ষণেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল ভাস্করের কপাল।

—পেছনের সীটে বসলে গল্প করব কী করে? এসব ডেলিকেসি অর্থহীন।

এক টুকরো বঙ্কিম হাসি কুন্তলার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের রেখার মতো ঝলক দিয়ে গেল। শুধু সেক্রেটারী হিসাবে নয়, ভাস্কর তাকে পেতে চায় আরো কাছে, আরো নিবিড়ভাবে। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, তার কঠিন হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে ক্ষুধার্ত পুরুভুজের প্রসারিত বাহুগুলোর মতন। নিরুত্তরে কুন্তলা উঠে বসল তার পাশে, টেনে বন্ধ করে দিলে দরজাটা।

মসৃণ পীচের পথ দিয়ে নিঃশব্দে লঘুছন্দে এগিয়ে চলল মোটর। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কোম্পানী এই পথটাকে টেনে নিয়েছে জেলার সহর পর্যন্ত। রাইডের পক্ষে আদর্শ।

মোটরের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে নীচু গলায় ভাস্কর বললে, আমার পাশে বসতে অস্বস্তি লাগছে মিস্ রায়?

অপসৃয়মান দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলে কুন্তলা। বললে, অস্বস্তি আর কিসের? আমি আমার 'বসে'র নির্দেশ পালন করছি

—'বস্?'—ভাস্কর যেন অস্বস্তি বোধ করলে: শুধুই 'বস্'? Are we not friends, too?

—ফ্রেণ্ডস?—নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব এল: তা হবে।

ভাস্করের চোখ জ্বালা করতে লাগল, স্পন্দিত হতে লাগল ঠোঁট দুটো। কত বলবার আছে এর জবাবে, উদ্বেল কণ্ঠে, উচ্ছ্বসিত ভাষায়। ভাস্কর পড়েছে ট্যাগোরের রেড অলিণ্ডার্স, গার্ডেনার, পড়েছে লাভার্স গিফ্ট আর গীতাঞ্জলি। অঙ্কের ছাত্র হলেও কাব্যের প্রতি তার মোহ ছিল। সবুজ ধানের ক্ষেতে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ তাকে আকুল করে দিয়েছে, অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে সে খুঁজে ফিরছে কোন রঞ্জনাকে, যক্ষপুরীর দেশে নন্দিনীর হাতে জ্বলেছে কোন্ মায়ামন্ত্রের প্রদীপ? সমস্ত মনটা টগবগ করে ফুটতে লাগল, যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা খানিকটা জমাট বাষ্পে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার।

ভাস্কর বললে, কেন ফ্রেণ্ড হতে আপত্তি আছে নাকি তোমার?

কুন্তলার মুখ সূক্ষ্ম হাসিতে রেখায়িত হয়ে উঠল: অসম বন্ধুত্বের কোন মূল্য নেই। তার চাইতে বাস্তব সম্বন্ধটাই ভালো।

—বাস্তব?

—বাস্তব বই কি। আপনি তো প্র্যাকটিকাল মানুষ, কথাটা আপনিই ভালো বুঝবেন।

তীব্র প্রতিবাদে না-না করে উঠল মন, কিন্তু ভাস্কর কিছু বলতে পারল না। ট্যাগোরের কবিতা সে পড়েছে বই কি, কিন্তু স্ট্যাটিসটিক্সের ভাষা

ছাড়া তার প্রকাশ নেই। ঠোঁটের ওপর দাঁত রেখে ভাস্কর স্টিয়ারিঙে মনোনিবেশ করলে, ঘুরতে লাগল স্পীডোমীটারের কাঁটা।

পথে দুপাশে সোনার ধান আর আখের ক্ষেতে অনাবিল শরৎ। একদিকে রেললাইনের বাঁধ, তার তলায় ছোট ছোট ডোবাতে কলমী ফুল, শাদা আর রাঙা শালুকের মেলা বসেছে। কাশ দুলছে এখানে ওখানে, উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখীর পাখার সঙ্গে আকাশের নীল রঙ যেন একছন্দে মিলে গেছে। ফুলগাছগুলোর মাথায় স্বর্ণলতার জল ছড়ানো, যেন সোনার ওড়না জড়িয়েছে তারা।

ছোট ছোট গ্রাম আর পাড়া দেখা দেয়, মিলিয়ে যায় আবার। পাড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল কুন্তলার কাছে। এই হচ্ছে সীতাগঞ্জের বিখ্যাত গুড় তৈরীর অঞ্চল। কিন্তু তিন বছর মিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সে অঞ্চল বানচাল হতে বসেছে। আখ মাড়াইয়ের 'ক্রাসার'গুলো মরচে ধরে কাৎ হয়ে আছে মাটিতে, দশমণী কড়াইগুলো উবুড় হয়ে আছে, রোদে জলে গুড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। দাদন দিয়ে কতক জমির আখ কিনে নিয়েছে সুগার মিল, কতক জমির চাষারা আজকাল আর গুড় তৈরীর পরিশ্রম করতে চায় না, বেশী দামে কোম্পানীকে আখ বেচে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। তা ছাড়া যারা মজুর হয়ে ঢুকেছে তাদের তো কথাই নেই। মিল থেকে মুঠো ভরে মাইনে পায় তারা, জীবন যুদ্ধের প্রশ্নটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

বাইরের দিকে কুন্তলার কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ্য করলে ভাস্কর। বললে, গাড়ী থামাব? মাঠে একটু বেড়াবে মিস রায়? হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুন্তলা বললে, দশটা কিন্তু বাজে।

—বাজুক না।—মোটরের ব্রেক কষলে ভাস্কর: সময় মূল্যবান মিস রায়, কিন্তু সেটা মিলে—এখানে নয়।

নিরুত্তরে হাসলে কুন্তলা। তেমনি ছোট, আর সংক্ষিপ্ত একটুকরো হাসি।

মোটর থামিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। বাঙ্গলার চিরন্তন পল্লী। পচা ডোবা, জংলা আমের বন, দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের নখরাঙ্ক। আট মাইল দূরে সীতাগঞ্জ সুগার মিলের ঐশ্বর্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যটা অতি বেশি প্রকটিত। হাড় বের করা বলদ চলেছে ধুঁকতে ধুঁকতে। আশ্বিনের আবির্ভাবে শরৎলক্ষ্মী এসে আসন পাতেননি, ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে ম্যালেরিয়া। ভাঙা ঘরের বারান্দায় দড়ির খাটিয়াতে একটা লোক ছেঁড়া কাথা মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল।

এই কি সেই বাঙলা, ট্যাগোরের দেশ? এখানেই কি সবুজ ধানের ক্ষেতে কৃষ্ণকলির দেখা মিলবে? মুখ দিয়ে ভাবনার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল ভাস্করের: ইজ দিস্ বেঙ্গল?

ভাস্করের গলার অবজ্ঞার সুরটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধল কুন্তলার কানে। চোখের তারা দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। স্পষ্ট মৃদুস্বরে জবাব দিলে, নো, দিস্ ইজ ষ্টার্ভিং বেঙ্গল।

ভাস্কর চমকে তাকাল কুন্তলার মুখের দিকে। এ তার টাইপিস্ট সেক্রেটারী কুন্তলার কথা নয়। জালালাবাদ পাহাড়ে যাদের অস্ত্রে আগুন জ্বলেছিল, এর মধ্যে কোথায় যেন তার স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়।

কুন্তলা সুমিষ্ট কণ্ঠে ডাকলে, মিষ্টার নটরাজন্?

ভাস্কর আবার চমকে উঠল।

সত্যিই আমরা আজ থেকে বন্ধু তো?

নিশ্চয়, তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

তা হলে বন্ধুর অনুরোধ রাখো। এই দরিদ্র বাঙ্গলা দেশকে যারা লুঠ করে নিচ্ছে তাদের হাত থেকে একে বাঁচাও তুমি।

স্থির হয়ে দাঁড়াল ভাস্কর। সমস্ত চেতনা মুহূর্তে মুখর আর চকিত হয়ে উঠেছে। কুন্তলার চোখ দুটি যেন সম্মোহিত করবার ভঙ্গিতে তার ওপর আবদ্ধ হয়ে আছে। সে চোখে আলো ছায়ার মতো খেলা করে যাচ্ছে

বিপ্লবী নায়িকার অগ্নিদীপ্তি আর কাঁপন লাগা ঝাউবনের মাথায় শুকতারার স্নিগ্ধ আলোর ছটা।

মুগ্ধের মতো ভাস্কর বললে, আচ্ছা।

তারপর খানিকটা নীরবতা। পথ চলতি গাঁয়ের লোক সভয়ে সেলাম করলে দুজনকে। মুরুব্বিগোছের যারা বড় সাহেবকে চিনত, সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। কিন্তু ভাস্করের কাণের কাছে ক্রমাগত বাজতে লাগল বন্ধুর অনুরোধ। কুন্তলা একদিন তার কাছে আসবে হয়তো, কিন্তু তার সূচনাতেই যে প্রতিশ্রুতি তাকে দিতে হল, এ কি শুধু কথার কথাই? অথবা এর দাবী বেড়ে চলবে, বেড়েই চলবে, তারপর চরম মুহূর্ত যখন আসবে তখন সে পূর্ণ মূল্যের পরিমাণটা দাঁড়াবে কতখানি? কুন্তলার কালো চোখে যে ছায়া আর আগুন সে দেখেছে তার কোনোটাই তো মিথ্যে হওয়ার কারণ নেই।

ফিরবার পথে আকস্মিকভাবে কুন্তলার একখানি হাত তার হাত স্পর্শ করতে ভাস্কর মুঠো করে আঁকড়ে ধরলে শুভ্র নরম আঙ্গুলগুলো। কুন্তলা বাধা দিলে না, একটি কথা কইলে না, শিউরে উঠল না একবারও। শুধু কয়েক সেকেণ্ড পরে নিঃশব্দে হাতখানা সরিয়ে এনে শান্ত গলায় বললে, এখন নয়।

দিনের পর দিন। ভাস্কর আবিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কুন্তলার মন তার প্রতি আর বিমুখ নয় এখন, এ সত্যটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে তার কাছে। কাজের অবসরে দু'চারটে বাজে কথা বললে কোনো প্রতিবাদ আসে না, বরং মাঝে মাঝে জবাব পাওয়া যায়। কোনো একটা ঘনীভূত অবকাশে হাতখানা নিজের কাছে নিয়ে এলে সরিয়ে নেয়না, বরং উষ্ণ কোমল স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঘাম জমে উঠতে থাকে। আর অঙ্কবিদ বিজ্ঞানী ভাস্কর ক্রমেই মুখর হয়ে উঠছে, আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করছে ভালো করে কথা বলবার ক্ষমতা। দরকার হলে আগেই আস্তিন গুটিয়ে মেসিনের

কাজে লেগে যেত, তিনদিন দাড়ি না কামালেও তার খেয়াল থাকত না। কিন্তু আজকাল ভাস্কর নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে পরিপূর্ণভাবে। প্রসাধন, জামা-কাপড়ের ক্রীজ, সব কিছু সম্পর্কেই সে পুরোপুরি সজাগ।

কাজ করতে করতে ভাস্কর আড় চোখে লক্ষ্য করছিল কুন্তলাকে। সুঠাম আঙ্গুলগুলো যেন খেলা করে যাচ্ছে টাইপ রাইটারের চাবিগুলোর ওপরে। গালে কপালে ছড়িয়ে আছে অলকগুচ্ছ। লাল টকটকে রঙের শাড়ী পরেছে একখানা, তার তীব্রতা যেন চোখকে আঘাত করে। কালো পাড়টা গায়ের ওপর দিয়ে সরীসৃপের মতো পড়ে আছে।

মে আই কাম ইন সার ?

এমন মুহূর্তটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জেনারাল ম্যানেজার ভাস্কর উঠল জেগে।

কাম ইন।

ঘরে ঢুকল কেমিস্ট কান্তি সান্যাল। কুঞ্চন দেখা দিল ভাস্করের মুখে। এই লোকটাকে দু চোখে দেখতে পারে না সে। ভাস্করের কী একটা মন্তব্যে ভুল ধরেছিল একবার। সেই থেকেই কান্তির প্রতি তার একটা বিদ্বেষ ঘনায়িত হচ্ছে প্রত্যেকদিন। তা ছাড়া সব চাইতে আপত্তিকর এই যে কী একটা পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে কুন্তলার সঙ্গে তা'র ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, দুজনে এক-সঙ্গে চা খায় মাঝে মাঝে, পড়াশুনো করে। তীব্র ঈর্ষার প্রেরণায় ভাস্কর ছিদ্র খুঁজছে কান্তির। কিন্তু কান্তি অত্যন্ত কাজের লোক, সরানো সহজ নয় তাকে।

কান্তির মুখে আধ-বোজা চোখ রেখে প্রশ্ন করলে, কী চাই আপনার ?

—একটা নিবেদন আছে।

—বলুন। সংক্ষেপে সারতে হবে, আমার সময় কম।

—সংক্ষেপেই বলছি—ভাস্করের টেবিলটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল কান্তি সান্যাল। বললে, অত্যন্ত অবিচার হচ্ছে। আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।

—আমি আপনার ডিক্টেশন চাচ্ছি না—ভাস্করের স্বরে উষ্ণতা প্রকাশ পেল : আপনি শুধু রিপোর্ট করতে পারেন।

—সে তো বটেই, ম্যানেজার আপনি!—কান্তি বিনীত হাসল : কথা হচ্ছে গ্রাম থেকে যারা আখ নিয়ে আসে, গাড়ীর ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু গাড়ীর ওজন বাদ দিতে গিয়ে তাদের আখের অর্ধেক ওজন বাদ দেওয়া হচ্ছে। এ গরীবের ওপর অত্যাচার।

টাইপ-রাইটার থেকে মুখ তুলে কুন্তলা তাকাল একবার। তারপর আবার মাথা নামিয়ে নিলে।

অন্যসময় হলে ভাস্কর হয়তো মন দিয়ে শুনত কথাটা, কিছু ব্যবস্থাও করত হয়তো। কিন্তু কান্তির কাছ থেকে কথাটা আসতেই সে অকারণে অধৈর্য হয়ে উঠল। দাঁতের কোণে চেপে ধরলে চুরুটটা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, হ্যাট ইজ নট ইয়োর লুক-আউট। আপনি কেমিস্ট, ল্যাবোরেটরী সম্বন্ধে কিছু বলবার না থাকলে আপনি যেতে পারেন।

কান্তি সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। পাঞ্জাবীর আড়ালে প্রসারিত বুকখানা দেখাতে লাগল কঠিন একটা লোহার বর্মের মতো। স্থিরগলায় বললে, আমার লুক-আউট না হতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

ভাস্কর পিঠ খাড়া করে বসল চেয়ারে। কঠিন খর্ব আঙুলগুলো শক্ত মুঠোয় একটা কাঁচের পেপার-ওয়েটকে আঁকড়ে ধরলে। বললে, সেজন্যে অন্য লোক আছে। তারা আমাকে জানাবে। আপনার অনধিকার-চর্চা করবার দরকার নেই।

—দরকার আছে বলেই বলছি। আপনার অন্য লোক সব 'করাপ-টেড', চুরির অংশীদার তারা।

আগ্নেয়-শিলার মাটিতে পড়ল লোহার ঘা, জ্বলে উঠল আগুন। ভাস্কর রূঢ়স্বরে বললে, অত্যন্ত ইম্পার্টিনেন্স। আপনি চলে যেতে পারেন।

কান্তি একেবারে ঝুঁয়ে পড়ল ভাস্করের মুখের দিকে। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর

দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে জ্বলতে লাগল ক্ষুধার্ত বাঘের মতো : আমি আপনাকে ইনসিস্ট্ করছি স্টেপ নেবার জন্যে। নইলে রেজাল্ট খারাপ হবে।

চেয়ার ছেড়ে ভাস্কর লাফিয়ে উঠল : ভয় দেখাচ্ছেন ?

কান্তি এক পাও পিছিয়ে গেল না : যা মনে করেন।

—আই ডিসচার্জ ইউ। পনেরো দিনের নোটীশ দিলুম।

—থ্যাঙ্কস—বর্মা চটির শব্দ করে বেরিয়ে গেল কান্তি।

ভাস্কর বসল চেয়ারে। হাত পা সমস্ত কাঁপছে। এই মিলের সে জেনারেল ম্যানেজার, তাকে ভয় দেখিয়ে যায় একজন কেমিষ্ট ! দ্রুত কম্পিত সে তৎক্ষণাৎ লিখলে কান্তির বিচ্যুতি-পত্র। বাকী পনেরো দিনের বেতনও কান্তি পাবে, ভাস্কর অবিবেচক নয়।

কুন্তলা নীরবে টাইপ করে চলেছে। চোখের সামনে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ কোন কিছুর সঙ্গে যেন কিছুমাত্র সংযোগ নেই তার। তেমনি তার তনুদেহকে ঘিরে জ্বলছে লাল-শাড়ীর দীপ্তি, তার গালে কপালে ছড়িয়ে আছে অলক-গুচ্ছ, নাচের ভঙ্গীতে আঙুলগুলো খেলা করে যাচ্ছে টাইপ-রাইটারে চাবির ওপর।

রুদ্ধ কম্পিত স্বরে ভাস্কর বললে মিস্ রায় ?

—স্যার !

—এইটে টাইপ করে দাও এক্ষুণি।

লঘু চরণে কুন্তলা এগিয়ে এল। ভাস্করের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে মৃদুভাবে প্রশ্ন করলে, সত্যিই কি আপনি ডিসচার্জ করলেন ওঁকে ?

—এর পরেও ডিস্চার্জ করব না ?

মুখের চুরুটটা ভাস্কর হিংস্রভাবে ছুঁড়ে ফেলল ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটার মধ্যেই : আমাকে ভয় দেখাতে আসে স্কাউণ্ড্রল !

কুন্তলা নিরুত্তরে ফিরে গেল চেয়ারে। টাইপ-রাইটারের স্বর বাজতে লাগল এক টানা। নিরাসক্ত আর নির্বিকার।

ফলাফলটা টের পাওয়া গেল পরের দিনই।

কান্তি সান্যাল কোন সুযোগে এতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কে বলবে। তাকে কাজে না নিলে স্ট্রাইক করবে মিলের অধিকাংশ—অবশ্য আখের দাম যারা চুরি করে তারা বাদে। গ্রাম থেকে আখ আর আসবে না। দীগন্তে নেমেছে যুদ্ধের ছায়া, ওয়াগন দুর্লভ, মোতিহারীর চালান প্রায় বন্ধ। গ্রামের লোকের ওপর অনেকখানি ভরসা, নইলে মিলের আর্ধেক কাজ আটকে পড়ে থাকবে।

খবর পেয়ে ভাস্কর জ্বলতে লাগলো মশালের মতো। স্ট্রাইক করবে! করুক না। সে-ও বন্ধ করে দেবে মিল এক সপ্তাহ ভাতা না পেলেই সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে। আর গ্রামের লোক? সাতদিন আখ না কিনলে ক্ষিদের জ্বালায় এসে লুটিয়ে পড়বে, সেদিন কোন কান্তি সান্যাল তাদের ভাতের থালা বেড়ে দেবে না। এমন ভাস্কর অনেক দেখেছে। তিন বছরের অনভ্যাসে গুড় জ্বাল দিতে ভুলে গেছে সীতাগঞ্জের লোক। তাদের দশমণী কড়াইগুলো ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে মাটিতে, ক্রাসারের চাকাগুলো আজ সহজে আর ঘুরবে না।

—মিষ্টার নটরাজন?

কুন্তলার গলার শব্দে চমকে উঠল ভাস্কর। পেছনের দরজা দিয়ে কখন ঘরে এসেছে। সেই লাল শাড়ী যেন নেশার মত আচ্ছন্ন করে রয়েছে তাকে, তার প্রসাধন উজ্জ্বল দেহটা যেন ডুব দিয়ে এসেছে লবণের সমুদ্রে। মিষ্টি গন্ধের একটা তরঙ্গ এসে ভাস্করের স্নায়ুকে যেন চকিত করে দিলে।

—এসো, এসো মিস্ রায়। বোসো এখানে।

কুন্তলা এসে বসল সোফাতে। বেশবাস আর রূপ সজ্জায় দেখাচ্ছে তাকে মায়াবিনীর মতো। কালো চোখ দুটিতে অলিওয়ার্সের নন্দিনীর স্বপ্নাভাস। এখন তার কাজের সময় নয়, তবু অসময়ে এসে দেখা দিয়েছে ভাস্করের প্রাইভেট চেম্বারে।

—তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন মিষ্টার নটরাজন! শরীর কি ভালো নেই ?

—কুন্তলার স্বরে যেন মধু উপছে পড়ল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাস্কর এগিয়ে এসে বসলো কুন্তলার পাশে।

—মিলের খবর তো শুনেছ। স্ট্রাইক করবে ওরা।

—স্ট্রাইক করবে ? —অত্যন্ত মধুরভাবে হাসল কুন্তলা: করুক না। তোমার মতো ম্যানেজার যখন আছে, তখন আর ভাবনা কি!

মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ভাস্করের মন। লোলুপ দৃষ্টি আশ্রয় খুঁজতে লাগল কুন্তলার মুখের ওপর: তুমি আমাকে সাহায্য করবে মিস্ রায় ?

—নিশ্চয় করব, কেন করব না! উই আর ফ্রেণ্ডস্। মোর দ্যান দ্যাট।

—মোর দ্যান দ্যাট! —ভাস্করের কাছে চকিতে মিথ্যে হয়ে গেল এই ফ্যাক্টরী, এই বিভ্রাট, কান্তি সান্যালের যা কিছু ধৃষ্টতা। রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিলে, মোর দ্যান দ্যাট ?

কুন্তলার গালের লালিমা আরো ঘন হয়ে উঠেছে। নীলার মতো জ্বলছে নীল চোখ, সে চোখে সমস্ত না-বলা কথাই অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কম্পিত আঙুলে ভাস্করের প্রসারিত বাহুতে মৃদু আঘাত দিয়ে বললে, বড্ড মাথা ধরেছে আমার। আমাকে একটা রাইড দেবে তুমি ?

শিরায় শিরায় রক্তের কলধ্বনি বেজে উঠল জোয়ারের জলের মতো। উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। ভাস্কর মুখখানাকে আরো ঝুঁকিয়ে দিলে কুন্তলার দিকে: রাইড নিশ্চয় দেব, কিন্তু তুমি—

চকিতে নিজের মুখ সরিয়ে নিলে কুন্তলা। বললে, একটু পরে। রাইড থেকে ফিরবার পরে।

উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে সংযত করে নিলে ভাস্কর। বললে বেশ, তাই চলো।

মোটর পথের ধারে রেখে দুজনে এগিয়ে চলল আলোর পথ দিয়ে। ধানের জমি শেষ হয়েই খানিকটা জংলা মাঠ. এখানে ওখানে ফুটেছে বন-গোলাপ, লজ্জাবতীর বেগুনে রঙে আকীর্ণ হয়ে আছে মাটি। ছোট জলার ওপারে কাশের বন যেন আয়নায় মুখ দেখছে। বিকালের পড়ন্ত আলোয় ধূসর রঙের দুটো খরগোস কাণ খাড়া করে পালিয়ে গেল স্নমুখ দিয়ে। উঁচু উঁচু ঢিবির ওপর ঘন শ্যামল ঘাসের মখমল বিছানো।

ভাস্কর বললে এসো, বসা যাক।

দুজনে বসল একটা ঢিবির ওপর। পথচলতি কুন্তলা কোন্ সময় একটা বনগোলাপ তুলে নিয়ে পরেছে খোঁপায়। বাতাসে ভাসছিল তার লঘু স্নরভি। গেরুয়া রঙের রোদে অপরূপ দেখাচ্ছে মুখখানা, লাল শাড়ীটা জলছে যেন একপাত্র বিলিতী মদ। চাঁপা ফুলের মতো হাতখানা কোলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে স্নকুমার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।

ভাস্কর কুন্তলার কাছে অত্যন্ত ঘন হয়ে বসল। সমস্ত মাঠটা বিস্ময়কর-ভাবে নির্জন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। একদিকে আকাশটা রক্তে মাখা, অন্যদিকে গাছপালাগুলো সব কালো হয়ে আসছে—সমষ্টিভূত, অবয়বহীন ক্যামেরার সিলুয়েত ছবির মতন।

—মিস রায়?

কুন্তলা কোনো উত্তর দিল না। শুধু প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে তাকাল ভাস্করের মুখের দিকে। সে চোখে শরতের আকাশের নির্মল নীলিমা, বিকসিত শাপলা-শালুকের প্রসন্নতা। কৃষ্ণকলি আর নন্দিনী একাকার হয়ে গেল।

ওরা যখন মোটরে ফিরে এল, তখন রাত হয়েছে সামান্য। দিগন্তে দেখা দিয়েছে চাঁদের ফালি, বন-গোলাপের মৃদু গন্ধ রাত্রির হাওয়ায় শরীরী হয়ে উঠেছে। জলার জলে জলছে মাণিক। ভাস্করের সমস্ত চেতনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রক্তের চাঞ্চল্য গেছে থেমে, কিন্তু শরীরের প্রান্তে প্রান্তে তখনো

সেতারের মীড়ের মতো স্পন্দন বাজছে। কুন্তলা তার শেষ গানটার একটা কলি গুঞ্জন করছে তখনো ঃ এঁকে যাব আমার গানের আলপনা—

মোটরটা চলেছে আস্তে আস্তে। এই রাত্রি, এই গান—প্রাণহীন যন্ত্রটাকেও যেন নিশি পেয়েছে।

সামনে সীতাগঞ্জের সুগার মিল। ইলেকট্রিক আলো ঝলমল করছে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বন-গোলাপের গন্ধ চঞ্চল আরণ্য পৃথিবী—মোহ জাগানো বনজ্যোৎস্না। ভাস্কর সরে বসল কুন্তলার পাশ থেকে।

বাজারটা পেরোতেই কুলি বস্তি। তার সামনে এসেই আটকে গেল মোটরটা। পথ বন্ধ। প্রকাণ্ড জনতা সামনেটা আটকে রয়েছে, সভা করছে। অসহিষ্ণু ভাস্কর হর্ণ বাজাল।

কিন্তু লোকগুলো সরে গেল না, বরং হর্ণের শব্দে তারা যেন উত্তাল হয়ে উঠল। একটা কলরব ছড়িয়ে গেল চারদিকে—ম্যানেজার!

মুহূর্তে প্রায় পঞ্চাশজন লোক ঘিরে ধরল মোটরটাকে।

—হুজুর, বিচার চাই।

ঘা-খাওয়া সাপের মতো ফণা তুলল ভাস্কর। আচ্ছন্ন আঙুলগুলো চমকে উঠে নিষ্ঠুরভাবে পড়ল স্টিয়ারিংয়ের লোহার ওপর ঃ কিসের বিচার?

কান্তিবাবুকে আবার বাহাল করতে হবে। চাষাদের যারা ঠকায়, তাদের শাস্তি দিতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার শিখায়িত হয়ে উঠল। তীব্র কণ্ঠে কী একটা বলবার উপক্রম করতেই চমকে তাকাল পাশে কুন্তলার দিকে। কুন্তলা তাকে স্পর্শ করেছে।

দুজনের দৃষ্টি মিলল। কুন্তলার চোখে আলোছায়া খেলা করছে। চোখের তারা দুটো জ্বলছে নীলার মতো। কুন্তলা মধুর অলস গলায় বললে, আজকের সন্ধ্যাটাকে নষ্ট করে দিতে চাও তুমি?

কী বলতে যাচ্ছিল, কী বলা উচিত, ভাস্করের মন থেকে দেখতে দেখতে

মিলিয়ে গেল তা। সম্মোহিতের মতো বললে, কী খবর ?

ওদের বলে দাও, কান্তিবাবুকে আবার কাজ নেবে তুমি। ওদের ওপর সুবিচার করবে।

তীব্র সংঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল মন। পরাজয়! শেষকালে পরাজয় স্বীকার করতে হবে তাকে। কিন্তু—কিন্তু কুন্তলার চোখ তখনো তার ওপরে স্থির হয়ে আছে। নিষ্পলক নীলার মতো উজ্জ্বল আর শাণিত।

মন্ত্রমুগ্ধ ভাস্কর প্রতিধ্বনি করে গেল, বেশ কান্তিবাবুকে আবার কাজে নেব আমি। সকলেরই সুবিচার হবে।

আকাশ কাঁপিয়ে উঠল কোলাহল, উঠল জয়ধ্বনি। কিন্তু জয়ধ্বনি ভাস্করের নয়, কান্তির।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে ভাস্কর আবার মোটরে স্টার্ট দিলে। সামনে মিল। লোহায় লক্করে যন্ত্রপাতিতে বিরাট এবং তর্কাতীত বাস্তবতা। পোড়া ক্রুড অয়েলের কড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কিন্তু এ কী করে বসল ভাস্কর। এই যে দুর্বলতার প্রশ্রয় সে আজ দিল এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। জনতার দাবী—সে দাবী তো হাতের মুঠোর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না। সে দাবী বেড়ে চলবে, বেড়েই চলবে। তারপর ত্রিপাদ বামনের মতো একদিন—

কুন্তলার প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল ঃ দিস্ ইজ স্টার্ভিং বেঙল ;

তবে ? তবে ? ভাস্কর যেন বিদ্যুতের চমক খেল একটা। তবে কুন্তলা কি ?—কিন্তু সংশয়টা স্পষ্ট রূপ নিতে গিয়েই আবার পরক্ষণে বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল। কুন্তলার নীলার মতো চোখ দুটো তখনো মোহিনী মায়ায় জ্বলছে। এই চোখ, এমনি চোখ আর একবার কোথায় দেখেছিল ভাস্কর ? হাঁ—তার নিজের দেশেই, মাদুরা অঞ্চলের এক নটরাজের মন্দিরে। নটরাজের তৃতীয় নেত্রে এমনি একখণ্ড হীরা জ্বলছে, উজ্জ্বল, অপরূপ। কিন্তু সে হীরার তীব্র বিষ সঞ্চারিত, স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।

প্রদীপ ও প্রজাপতি

গল্প লেখবার চেষ্টা করছিলাম।

সামনে ক্যাণ্ডল-স্ট্যাণ্ড থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মোম গ'লে পড়ছে নীচের প্লেটটার ওপর—মোমবাতির ঋজু দীর্ঘ দেহটা অতি ধীরে ধীরে হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে আসছে। বাইরে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি, সামনে বরেন্দ্রভূমি বা বারিন্দার প্রসারিত ধানের ক্ষেত—গরুর গাড়ির কঠিন চাকায় ক্ষত-বিক্ষত বর্ষা-পঙ্কিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা হাঁসমারির খাঁড়ির ওপারে জ্যোৎস্নার কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, দৃষ্টির অতীত ওই জ্যোৎস্নাময় পৃথিবীটা যেন এখানকার মত মৃৎপিণ্ডে তৈরি নয়, ওখানকার ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ বায়বীয়। যেন জ্বলন্ত নীহারিকার অবয়বহীন খানিকটা বাষ্পরূপ রাত্রির আকাশের তলা দিয়ে এক ঝাঁক সরালি হাঁস শীতলীর দীঘির দিকে চ'লে গেল, নিদ্রিত আকাশের তলায় বহুক্ষণ ধ'রে বাজতে লাগল অপস্রিয়মান পক্ষধ্বনির একটা দ্রুত তরঙ্গ।

এলোমেলো মুখ—টুকরো টুকরো ছবি। আধুনিক কবিতার মত অচেতন সত্তা থেকে ভিড় ক'রে আসছে অসংলগ্ন চিন্তাধারা। 'সিলুট' ছবির মত পলকে পলকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে ছায়াময় পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য পটভূমিকা। কোনটাই স্পষ্ট ক'রে ধরা দেয় না, অগণিত সূচনার খণ্ড সুরগুলো সমষ্টিগত একটা ঐকতানের মধ্যে বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর কলমটা নামিয়ে রেখে, তারই একটা সূত্র ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ বাইরে থেকে কি একটা পতঙ্গ উড়ে এল, ফরফর ক'রে পরিক্রমণ করতে লাগল মোমবাতির নীলাভ শুভ্র শিখাটাকে। তাকিয়ে দেখলাম, রাত-

চরা একটা বড় আকারের প্রজাপতি। বর্ণ-গৌরবে খুব চমৎকার নয়, অন্তত কবি-কল্পনাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু নিরাভরণ এই অসুন্দর প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে চকিতে একটা কাহিনী মনে প'ড়ে গেল। সত্যিকারের কাহিনী। অনাগত অস্বচ্ছ গল্পগুলোর ভিড় ঠেলে মনশ্চক্ষের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সত্ত নিয়ে উড়তে লাগল অনাহূত এই প্রজাপতিটার মতই!

* * * * *

ছুটিতে দেশে আসতে হয়েছিল।

দু-চার দিনের জন্য গ্রাম আমার মন্দ লাগে না। কখনও কখনও অলস-কল্পনার মুহূর্তে দস্তুরগত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি, উচ্ছল নাগরিকতার বাইরে পলাতক জীবন যাপন করবার স্পৃহা জাগে। ছেলেবেলায় সোনা-পিসীমাদের বাড়ি এদিক দিয়ে আমার আদর্শস্থল ছিল।

গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে ছোট একটি খাল ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে এঁকেবেঁকে একেবারে সাহেবের চর ষ্টীমার-ঘাটের নীচে আড়িয়লখাঁয় গিয়ে নেমেছে। সেই খালের ওপরে নড়বড়ে বাঁশের চার বা সাঁকো পার হ'লেই সোনা-পিসীমার বাড়ি। ভাঁট ফুলের এলোমেলো জঙ্গল ছাড়িয়ে সুপুরির বাগান, ঘন ছায়ার তলা দিয়ে স্যাঁতসেঁতে কালো মাটির ভিজে পথ পায়ের দাগে দাগে চিহ্নিত হয়ে এগিয়ে গেছে মুখুজ্জে-বাড়ি পর্যন্ত। পথের আশেপাশে চার-পাঁচটি মঠ বা চিতা, মুখুজ্জে-বাড়ির লোকান্তরিত প্রাক্-পুরুষদের স্মরণচিহ্ন। আমাদের পূর্ব-বাংলার গ্রামে প্রায়ই কোন নির্দিষ্ট শ্মশানভূমি থাকে না, নিজেদের জমির এলাকাতেই শবদাহ করবার নিয়ম।

সোনা-পিসীমারা এককালে খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় এবং ভূতপূর্ব মুখুজ্জেদের আনুষঙ্গিক দোষে সে অবস্থায় ভাঁটা পড়েছে এখন। দোল-দুর্গোৎসব আজও হয়, কিন্তু এখন সে সব নিছক

পূর্বপুরুষদের ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষা করা মাত্র। চণ্ডীমণ্ডপের অবস্থা জরাজীর্ণ, আগাগোড়াই হোগলার বেড়া বেঁধে দিতে হয়েছে। একবার বৈশাখের ঝড়ে নাটমন্দির উপড়ে পড়েছিল, তারপরেই রাতারাতি টিনগুলো যে কোথায় চালান হয়ে গেল, আজও তার হদিস মেলে নি। দোলমঞ্চটায় অসংখ্য ফাটল, বিষধর সাপের আস্তানা। তিন বছর থেকে দুর্গাপূজায় আর প্রতিমা তৈরি করা হয় না, ঘটের মাথায় ফুল-জল দিয়েই দেবীকে আহ্বান করা হয়। পিতৃপিতামহের ধারা, তাই একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া চলে না।

একেবারে অসচ্ছল অবস্থা এখনও বলা যায় না। তালুক থেকে সম্বৎসরের ধান চাল আসে, ছোট্ট সংসারটি চ'লে যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং পরিপাটি ভাবে। আর সোনা-পিসীমার হাতের চিঁড়ের মোয়া সারা গ্রামে সুবিখ্যাত, আমার পক্ষে সেটাও একটা দুর্বার আকর্ষণ।

বাগান পেরিয়ে বাড়ির ভেতর পা দিতেই টুনু-বউদির সঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা হয়ে গেল। উঠনের একপাশে ছোট চালার নীচে ঢেঁকি বসানো। টুনু-বউদি চিঁড়েই কুটছিলেন বোধ করি। নোলক-পরা ছোট একটি প্রতিবেশিনী মেয়ে ঢেঁকির সামনে বসে ছিল, নতুন মানুষ দেখে সে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাছকোমরটা খুলে নিয়ে ঘোমটার মত ক'রে মাথায় তুলে দিলেন টুনু-বউদি। তারপর আমার দিকে একরকম ছুটে এলেন বললেই হয়। অ্যা, রঞ্জন-ঠাকুরপো যে! গরিবের বাড়িতে পথ ভুলেই এলেন নাকি?

টুনু-বউদি সেই জাতের মানুষ, যার কেবলমাত্র উপস্থিতিটাই অকারণ প্রসন্নতায় মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে। স্বাস্থ্যপুষ্ট শ্যামল মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল, কপালে আর সীমন্তে সিঁদুরের রক্তরাগ। রুক্ষ চুলের নীচে প্রশস্ত ললাটের প্রান্তে প্রান্তে মুক্তাচূর্ণের মত ঘামের বিন্দু জ'মে উঠেছিল।

বললাম, সত্যি, কদিন সময় পাই নি। তারপর সবাই ভাল তো?

টুনু-বউদির মুখের ওপর কেমন একটা ছায়া পড়ল। বললেন, না ভাই, ভাল আর কোথায়? মাকে নিয়েই বড্ড অশান্তিতে আছি।

—মাকে নিয়ে? পিসীমা? তাঁর আবার কি হয়েছে?

—ওঃ, আপনি জানেন না বুঝি?

বউদির চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল। বললেন, গত বছর কার্তিক মাসে খুব বেশি অসুখ হয়েছিল, কোন আশাই ছিল না। সেরে উঠেছেন, কিন্তু ডান দিকের সব অঙ্গগুলো একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। বয়স তো আর কম হ'ল না। ঘরে চলুন না, দেখবেন।

ঘরে ঢুকতেই মুহূর্তে মনটা আড়ষ্ট এবং সংকুচিত হয়ে উঠল। সোনা-পিসীমাকে এ অবস্থায় দেখবার কল্পনা কোন দিন করতে পারি নি। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের সূর্য তার রক্তরশ্মি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই খানিকটা অত্যন্ত করুণ হয়ে পিসীমার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। মুখখানা বাঁ দিকে অদ্ভুত রকমে বড়শির মত বেঁকে এসেছে, ডান চোখটা ভীতিকরভাবে বিস্ফারিত, যেন তলার থেকে আর একটু ধাক্কা লাগলেই কোটর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাবে। ঘরময় অস্বাস্থ্যকর একটা গন্ধ। যে অংশটায় আলো পড়ে নি, সেখানে অস্বচ্ছ খানিকটা ছায়া জমাট বেঁধে রয়েছে অন্ধকারের মত। কাঠের একটা বেঁটে টিপয়ের ওপর কতগুলি কবিরাজী শিশিপত্র, একটা সাদা কানা-ভাঙা চীনামাটির পাত্রে মলমজাতীয় খানিকটা সবুজ জিনিস। ঠিক বিছানার ওপরেই অপরিচ্ছন্ন একটা পিতলের পিকদানি। সবটা মিলিয়ে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর অতি প্রত্যক্ষ বিষনিশ্বাস যেন আমি অনুভব করলাম।

বউদি বললেন, মা, রঞ্জন-ঠাকুরপো এসেছেন।

পিসীমা উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর বাঁ চোখটা পরিচিত স্নেহ-কোমলতায় করুণ আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বললেন, কে, রঞ্জন? কতদিন পরে এলি বাবা! ভাল আছিস তো?

বললাম, ভালই আছি পিসীমা।

—বেঁচে থাক বাবা, রাজরাজ্যেশ্বর হয়ে থাক। বঙ্কুর কাছে শুনেছিলাম, বি, এ, পাস করেছিস তুই। শুনে কত যে খুশি হয়েছি, কি বলব। তা চাকরি-বাকরি কিছু কি জুটল?

—আপাতত কলকাতায় এম, এ, পড়ছি পিসীমা।

—কলকাতা? মুহূর্তে সোনা-পিসীমার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের যে সোনালী আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই আলোতে তাঁকে অনেকখানি স্বতন্ত্র ব'লে মনে হ'ল।

সোনা-পিসীমা যেন অনেকটা স্বগতোক্তি করলেন, বঙ্কুর ইচ্ছে বউমাকে কলকাতা নিয়ে যায়। মেসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আপিস করতে ওর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। আর আমি তো পাঠিয়েই দোব ভেবেছিলাম, কিন্তু অসুখে প'ড়েই—

টুনু-বউদি বাধা দিলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওসব কথা থাকুক মা। মালিশের তেলটা এনে দোব? কবিরাজমশাই তো বিকেলবেলাই মালিশ করতে ব'লে গেছেন।

সোনা-পিসীমা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাঁকা মুখখানার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হতে লাগল। মনে হ'ল, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই কি একটা অলক্ষ্য বস্তুর হস্তস্পর্শ—এদের দুজনের মাঝখানে কোথায় বিচ্ছেদের একটা সূক্ষ্ম রেশমী যবনিকা দুলছে। কেউ যেন কারও কাছে স্পষ্ট ক'রে ধরা দিতে চায় না। পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক পরিচয়ের আড়ালে অভিমান আর অবিশ্বাসের একটা ছায়ামূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সোনা-পিসীমা বললেন, মালিশ একটু পরে করলেও চলবে। বিজয়ার পরে রঞ্জন এসেছে বউমা, দুটি চিঁড়ে

মুড়কি দাও ওকে। যা বাবা, বাইরে বোস গিয়ে। রুগীর ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।

রোদের সোনালী রঙ ফিকে আর কালচে হয়ে আসছে। সোনা-পিসীমার বাঁ চোখটা বুজে এল, ডান চোখ তখনও অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। তাঁর ম্লান মুখের ওপর ছায়া ছড়াতে লাগল—ক্ষীয়মান পঙ্গু জীবন আর আভাসিত পাণ্ডুর মৃত্যু।

টুনু-বউদি বললেন, চলুন ঠাকুরপো, বাইরে চলুন। বেশি কথা কইলেই ওঁর অস্বস্তি বাড়ে।

দাওয়ায় একখানা হোগলা পেতে দিয়ে টুনু-বউদি আমার জন্যে এক থালা মোয়া আর নারকেলের সন্দেশ এনে হাজির করলেন।

অন্যমনস্কভাবে খেয়ে চলেছিলাম। ফাটল-ধরা দোলমঞ্চ আর জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে নানা অর্থহীন চিন্তা মনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাশেই চাটুজ্জেদের পোড়ো ভিটেতে এক বুক জঙ্গল। আজ প্রায় বিশ বছর হতে চলল, কলকাতায় গিয়ে বাস্তু বেঁধেছে তারা। ভাঙাচুরো ভিটেগুলির ওপর উইয়ে-ধরা দুটো একটা শালের খুঁটি, পচা বাঁশের টুকরো, ভাঙা মরচে-পড়া দু-একখানা টিন। গ্রামের লোকে দরজা-জানলা, কাঠ-বাঁশ যথাসম্ভব সরিয়েছে, সাপের ভয়ে এখন আর এদিকে কেউ পা বাড়ায় না। একেবারে খালের পাশেই বহুকালের পুরনো যে হিজলগাছটা চারপাশে বুড়ির মত জটা নামিয়ে দিয়েছে, তার তলায় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে যে শ্যাঁওলা-পড়া লম্বা বেদী, ওইটেই ছিল চাটুজ্জেদের কালীখোলা। গভীর রাত্রে খাল দিয়ে চলবার সময় 'কেরায়া' নৌকোর মাঝিরা ওখানে নাকি অসম্ভব মূর্তি দেখতে পায়, শুনতে পায় অমানুষিক কান্না!

হঠাৎ চমক ভাঙল। আঁচলের কোণটা হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে টুনু-বউদি হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, আপনি তো কলকাতায় থাকেন ঠাকুরপো, ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

বললাম, কে, বঙ্কুদা? হ্যাঁ, অনেক দিন আগে একবার পথে দেখা হয়েছিল বটে।

টুনু-বউদি অন্যমনস্কভাবে বললেন, এবার পূজোর সময় দেশে এসেছিলেন। বললেন, শরীরটা আদৌ ভাল যাচ্ছে না। মেসের খেয়ে দশটা পাঁচটা আপিস করা, বুঝতেই তো পারেন।

না বোঝবার কথা নয়। বললাম, কলকাতার বাসা করতে চান বুঝি?

—তাই তো বলছিলেন। কিন্তু মার এই অবস্থা, এখন ওঁকে ফেলে আর—

বললাম, তা ওঁকেও নিয়ে গেলে হয় না?

অপ্রসন্ন মুখে টুনু-বউদি চুপ ক'রে রইলেন। নীরবতার অর্থটা অত্যন্ত পরিষ্কার। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য অথচ অকারণ বিলম্বিত, সে ক্ষেত্রে নিষ্ফল সহানুভূতির বোঝা টানতে টানতে মানুষের ক্লান্তি আসবেই। শুশ্রূষায় তিক্ততা, সেবায় বিরক্তি।

বললেন, অঢেল খরচা, তা ছাড়া নাড়াচাড়া করতেও হাঙ্গামা আছে বিস্তর। আর একটা কথা কি, জানেন? মা কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবেন না, যেতেও দিতে চান না। ওঁর ধারণা, ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল-পাকড়—এর চাইতে সুখ নাকি কোথাও নেই।

—তা এমন মন্দ কি?

টুনু-বউদির চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠল; বললেন, মন্দ কি? আপনিও তাই বললেন? মাছ-তরকারির সুখটা কি এতই বড় হ'ল? শরিকী হাঙ্গামা, চোরের উপদ্রব, দিনরাত একজনের জন্যে দুশ্চিন্তা—আচ্ছা, আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, এতে লাভটা কি?

দৃষ্টির ভেতর দিয়ে টুনু-বউদির মনটি বেরিয়ে আসছিল। সায় দিয়ে বললাম, না, লাভ নেই।

বউদি আবার নীরব হয়ে রইলেন। সমস্ত উঠনটার ওপর দিয়ে আসন্ন

সন্ধ্যার ম্লানিমা। বাড়িটা বিচিত্রভাবে নির্জন, কেবল ঘরের ভেতর সোনা-পিসীমার কাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বললাম, অন্ধকার হয়ে এল বউদি, এবারে চলি। যাওয়ার আগে আর একদিন আসব।

বসুন না, তাড়া কিসের? আচ্ছা ঠাকুরপো, যদি সত্যিই এমন হয়, মানে—। একবার দ্বিধা ক'রে বউদি বললেন, মানে, কলকাতায় যদি আমাদের বাসা হয়, তা হ'লে খোঁজ-খবর নেবেন তো?

—বাঃ, নোব না!

টুনু-বউদির কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে স্বপ্নাতুর হয়ে আসছিল। সামনে সুপুরি-বাগানের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ভাবতে বেশ লাগে ঠাকুরপো, ছোট্ট একটি বাসা ক'রে আছি দুজনে। ছিমছাম গুছনো একটি সংসার। সন্ধ্যেবেলা উনি আপিস থেকে ফিরলে কড়ায় ক'রে খান কয়েক লুচি ভেজে দোব, চা ক'রে দোব। ছুটির দিনে দুজনে যাব আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায়, কোন দিন যাবো বায়োস্কোপ দেখতে। টকি আমার খুব ভাল লাগে ঠাকুরপো। মামার বাড়িতে থাকবার সময় দু-একবার দেখেছিলাম, তারপরে আর হয় নি।

বেশ তো, কলকাতায় গেলে প্রাণ ভ'রে টকি দেখবেন।

—আর থিয়েটার! ওঁর কোন্ এক বন্ধু নাকি থিয়েটারের পাস দেয় ওঁকে। ইচ্ছে করলেই উনি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে পারেন।

টুনু-বউদির বলবার আরও অনেক ছিল, কিন্তু আমার আর বসবার সময় ছিল না। দু-চার কথার পরে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টুনু-বউদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কেবল অন্ধকার বাগানের পথ দিয়ে আসবার সময় সোনা-পিসীমার কাসির শব্দটা তীরের মত এসে আমার কানে বিঁধতে লাগল।

আর কিছুদিন পরে খবর পেয়েছিলাম, সোনা-পিসীমা মারা গেছেন।

কাহিনীটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর বাদে একদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল বঙ্কুদার সঙ্গে।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে প্রণাম করছিলেন বঙ্কুদা। বগলে এক গাদা বই নিয়ে লাইব্রেরি-ওয়ার্কের পরে আমি ফিরে আস ছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। হঠাৎ বঙ্কুদার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে হাতের সিগারেটটাকে জুতোর তলায় চালান ক'রে দিলাম। আমাকে দেখে বঙ্কুদা হাসলেন। বললেন, আরে, রঞ্জন যে, ভাল আছ?

মাথা নেড়ে জানালাম, ভালই আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, দেশের সব কুশল তো?

—দেশ? দেশে কে আছে আর? মা মারা যাওয়ার পরে সবই তো এখানে তুলে এনেছি।

চকিতে বহুদিনের আগেকার একটি আসন্ন সন্ধ্যা মনে প'ড়ে গেল। চমকে বললাম, বউদিও এখানে?

বঙ্কুদা সলজ্জ ভাবে হাসলেন।

—বাঃ রে, সেটা আগে বলতে হয়! ঠিকানা দাও, কালই দেখা ক'রে আসব।

বঙ্কুদা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও বলেছে অনেক দিন। তা তুমি যে সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ ভায়া, তোমার পাত্তা কি সহজে মেলে! কয়েকবার খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নি।

বঙ্কুদা ঠিকানা দিলেন। বাগবাজারে কি এক হরিহর দাস বাই লেন। গলিটা কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ল না।

—খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হবে। জায়গাটা কি বলে—একটু ইয়ে কিনা। ওই মদনমোহনের বাড়িটা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলেই। তা কবে যাচ্ছ?

বললাম, যাব একদিন সময় ক'রে। বউদিকে ব'লে রেখো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখব বইকি। আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি ভাই। আমার আবার টিউশনি আছে, দেরি হয়ে যাবে।

অত্যন্ত অমায়িকভাবে হেসে বঙ্কুদা চ'লে গেলেন। আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবির ছেঁড়া কাঁধটা তাঁর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, মুখে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি, পুরনো ছাতাটার বর্ণসাম্যহীন তালিগুলোতে দারিদ্র্যের নখর-চিহ্ন।

কয়েক দিন নানা কাজে নিশ্বাস ফেলবার জো ছিল না। বেনামীতে এক বইওয়ালাকে নোট লিখে দিয়েছিলাম, কণ্ট্রাক্টের টাকা কটা আদায়ের জন্য দিন কয়েক হাঁটাহাঁটির ব্যাপার ছিল। সেটা মিটে গেলে টুনু-বউদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কলকাতার বহু গলির সঙ্গেই পরিচয় আছে। প্রাসাদপুরীর আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার পেছনে মানুষের গম্য-অগম্য অনেক অন্ধকার গহ্বরেই যাতায়াত করতে হয়েছে, তাই হরিহর দাস বাই লেনকেও আবিষ্কার করতে পারলাম। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে একটা বড় বাড়িকে ভেঙে অনেকটা জায়গা বার করা হয়েছে, সন্ধ্যা হ'লে সেখানকার চুন-সুরকির স্তূপের ওপর বিকৃতরূপা একদল মেয়ে বিফল প্রসাধন ক'রে খরিদ্দারের আশায় ব'সে থাকে, বিড়ি টানে, অশ্লীল ভাষায় ইয়ার্কি করে, একটু দূরে যে লোকটা লোহার উনুনে পেঁয়াজফুলরি ভাজছে তার সঙ্গে করে কলহ। ঠিক তারই পাশ দিয়ে ছোট্ট একটু কানা গলি—হরিহর দাস বাই লেন। সিউয়ার্ড ডিচের মত দেড় হাত প্রশস্ত অন্ধকার পথ—দু পাশে নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো গায়ের ওপর চেপে আসবার উপক্রম করে। পায়ের নীচে পচা ভাত আর মাছের কাঁটা, খবরের কাগজে মোড়া অকথ্য আবর্জনা।

ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বঙ্কুদার দেওয়া নম্বরটার কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল।

কোন ভদ্রলোক এমন জায়গায় বাস করতে পারে, এ কল্পনার অতীত। পুরনো একতলা বড় বাড়ি, চুন-সুরকি-খসা দেওয়ালে নগ্ন ইটগুলো কোণা বার ক'রে রয়েছে। সদর দরজায় কবাট নেই, একটা ছেঁড়া চট সেখানে পর্দ্দার মত ঝুলছিল।

কড়া নাড়বার জো নেই। গলা-খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বঙ্কুদা, বঙ্কুদা আছেন ?

—কে গো ?—নারীকণ্ঠে কর্কশ ভাবে প্রশ্ন এল, কাকে চাই ? পরক্ষণেই ছেঁড়া চটের ফাঁক দিয়ে প্রৌঢ়ার একখানা তামাটে কুৎসিত মুখ বেরিয়ে এল। শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখ আমার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সে মুখখানা আবার জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই মোশায়ের ?

সসঙ্কোচে বললাম, বঙ্কিম মুখুজ্জে এখানে থাকেন কি ?

খনখন ক'রে গলা বেজে উঠল, থাকেন না তো যাবেন কোন্ চুলোয় ? তা এখন তো তাঁর পাত্তা মিলবে না, তাঁকে পাওয়া যাবে রাত দশটার পরে। তুমি কি পাওনাদার বাপু ? তা হ'লে সোজা চ'লে যাও, তাঁর চাকরি নেই এখন।

বললাম, না, পাওনাদার নই। আমি তাঁদের আত্মীয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করব।

—আত্মীয় ? তা অত আদিখ্যেতার দরকার কি, আগে বললেই তো হ'ত। এস এস, ভেতরে এস। এ বাড়ী আমার, আমিই এখানকার বাড়ি-উলি।

ভেতরে ঢুকতেই প্রৌঢ়া বাঁ দিকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলে, ওই তাদের ঘর। আর কোন দিকে যেয়ো-টেয়ো না বাপু, আমার অন্য ভাড়াটে আছে। তাদের আবার আব্রু বড্ড বেশি।

নির্দিষ্ট ঘরখানার দিকে এগোতেই ধোঁয়ায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। একটা টিনের তোলা উনুনে সবে আঁচ দেওয়া হয়েছে,

নিবিড় কয়লার ধোঁয়ায় কোলের মানুষ দেখা যায় না। তবুও তার ভেতর দিয়ে ঘরের বারান্দায় আমি টুনু-বউদিকে দেখতে পেলাম।

বললাম, টুনু-বউদি, আমাকে চিনতে পেরেছেন?

টুনু-বউদি উঠে দাঁড়ালেন। হর্ষোচ্ছল গলায় বললেন, রঞ্জন ঠাকুরপো! এসেছেন?

কিন্তু টুনু-বউদির একী চেহারা! তিন বছর আগেকার সে মানুষটি আর নয়। এ তার একটা অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালমাত্র। চোয়ালের হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়ার আবরণ, কালো গর্তের ভেতর মলিন চোখ দুটো প্রায় ডুবে গেছে বললেই চলে। কাচের মার্বেলের মত অসুস্থ একটা ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন বহুদূর থেকে সে দৃষ্টি ভেসে আসছে।

ঘরের ভেতর থেকে ছেঁড়া একটা মাদুর এনে বউদি বারান্দায় পেতে দিলেন। বললেন, উঃ, কতদিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে!

বললাম, কিন্তু আপনার এ কি শ্রী হয়েছে বউদি! একেবারে যে চেনাই যায় না!

টুনু-বউদি ক্লিষ্টভাবে বললেন, কমাস থেকেই শরীরটা ভারী খারাপ যাচ্ছে ঠাকুরপো। রাত্রে ঘুসঘুসে জ্বর হয়, আর সেই সঙ্গে কাসি। উনি কী একটা কবিরাজী ওষুধ নিয়ে এসেছেন কদিন হ'ল, তাই খাচ্ছি একটু একটু।

স্থির দৃষ্টিতে আমি টুনু-বউদির মুখের দিকে তাকালাম। কোন ভুল নেই। এ বাড়ির আবহাওয়ায় দিনের পর দিন যে মৃত্যুবীজেরা পুষ্ট ও লালিত হয়ে চলেছে, তাদেরই অলক্ষ্য ক্ষুধা টুনু-বউদিকে স্পর্শ করেছে এসে। বুকের প্রাণপিণ্ড দুটোকে মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষে কেটে কেটে খেয়ে চলেছে তারা।

সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি পড়ল উঠানের কলতলার দিকে।

তরল কাদা আর এক রাশ উচ্ছিষ্ট। একটা কাক ডিমের খোলা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেল। তিন-চারটি মেয়ে কলতলায় প্রাণপণে বাসন মাজছে,

একটির বক্ষোবাস অশোভন রকমে অসংযত। ছেঁড়া গামছা পরা একজন রোমশ পুরুষ একটু দূরে একটা তোবড়ানো টিনের মগ হাতে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে অসংবৃত-বসনা মেয়েটির দিকে তার চোখের তির্যক দৃষ্টি ঘুরে আসছে। ওদিকের বারান্দা থেকে কে খানিকটা পানের পিক ফেললে, জল-কাদার সঙ্গে মিশে পিকের লাল রঙটা উঠানের অনেকখানি অবধি প্রসারিত হয়ে গেল।

দুর্বল কণ্ঠে টুনু-বউদি বললেন, সত্যি, বড্ড কষ্টেই আছি। আপিসে একজন মাদ্রাজীকে নিলে, তাইতে চাকরি গেল, এখন দুটো টিউশনিই ভরসা। তবু তো দুবেলা ছুটোছুটির কামাই নেই। একটা ছেলে হয়েছিল জানেন বোধ হয়, মাস তিনেক আগে রক্ত-আমাশয়ে ম'রে গেল, একবার ডাক্তার অবধি ডাকতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ভাবি, এর চাইতে গ্রামে থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কিন্তু ওঁকে এভাবে ফেলে কী ক'রে যাই ?

একটু থেমে আবার বললেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, বায়োস্কোপে 'বাংলার মেয়ে' দেখেছেন আপনি ?

টুনু-বউদির চোখ দুটো চকচক করতে লাগল, আশায় নয়—অশ্রুতে।

* * *

ভাবনায় ছেদ প'ড়ে গেল।

কলমে কালি ফুরিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, জলতে জলতে মোমবাতিটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, আর ক্যাণ্ডলস্ট্যাণ্ডের নীচের প্লেটখানার ওপর প'ড়ে আছে সেই প্রজাপতিটা,—মৃত্যুর স্পর্শে তার প্রসারিত ডানা দুটি নিশ্চল।

ভ্রূণ

পর পর তিনখানা নৌকো সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাটে এসে ভিড়ল। ঘস্-স্ স্। কাদার পাড় ঠেকেছে আর তার সঙ্গে মাথা তুলে বাধা দিয়েছে ডুবে যাওয়া ঘাসের বন।

ধাওয়াদের ডিঙ্গি। সারাদিন বিলে মাছ ধরে এই সন্ধ্যায় ফিরল ঘরে। নৌকার খোলের ভেতর বন্দী চিতলের লেজের ঝাপট শোনা যাচ্ছে, জলের মধ্যে খল খল করছে বোয়ালের ছানা। জালের গায়ে গায়ে কাঁটাওয়ালা চাঁদা মাছগুলো রূপোর চাকতির মতো আটকে রয়েছে।

কাদার মধ্যে লগি পুঁততে পুঁততে সৈফুদ্দিন বললে, দিনের পর দিন হল কী বিলের! সারাদিন জাল ফেলেও পাঁচ সের মাছ পাওয়া যায় না, এবার যে না খেয়ে মরতে হবে রে।

হাঁটু জলে নেমে জয়নাল ডিঙ্গিটাকে পাড়ে আনবার চেষ্টা করছিল। রুদ্ধশ্বাসে এবং রুদ্ধ আক্রোশে চাপা একটা গর্জন করলে সে। বললে ওই শালা 'বিনে'র দল। বারো মাস ভেসাল নামিয়ে চুনোপুঁটিগুলো অবধি সব সাবড়ে নিলে মাছ কি আশমান থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে নাকি?

খোলের ভেতর হাতড়াতে হাতড়াতে সৈফুদ্দিন বললে, সত্যি। পশ্চিম থেকে এসে এই 'বিন' আর 'মালা'রাই আমাদের রুজী মারবার মতলব করেছে। ওদের না তাড়ালে আর—

—কী করে তাড়াবে। কতগুলো করে টাকা জমা দেয় ওরা, ওরা হালিম শাহুর ধর্মপুত্তুর যে।

তৃতীয় নৌকোর মাঝি বসির ধাওয়া কোনো কথা বললে না। বলবার কিছুই নেই। অভাব অভিযোগ প্রত্যেক দিনের দুঃখ দুর্গতি, এর জন্যে

কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই কিছু। টাকায় একসের চাল। লুঙ্গির দাম পাচ টাকা, আট গণ্ডা পয়সা দিয়েও এক লাটিম জালের সুতো পাওয়া যায় না। বিলের মাছগুলো দিনের পর দিন ফুরিয়ে আসছে বিস্ময়কর ভাবে, সে-ও এই দুর্ভাগ্যেরই অংশ মাত্র। আল্লা মালেক ছাড়া এর জন্যে দায়ী নয় কেউ। বিনেরা নয়, মালারা নয়, হাসানপুরের শাহুরাও নয়।

সামনে বিলের কালো জল। আকাশ ভরা তারায় সে জল ঝলমল করছে। অন্ধকারে উড়ছে ঘরে ফেরা গাংশালিক। একটু দূরেই বানের জলে একটা মড়া ঘোড়া ভেসে এসেছে, দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত। সেটাকে নিয়ে কুকুরের কোলাহল।

ধাওয়ারা জাতিতে মুসলমান আর পেশায় জেলে। আদি নিবাস ছিল রাজশাহীর চলন বিলের ধারে, কিন্তু জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারে দিনাজপুর জেলার এই দক্ষিণাঞ্চলে এসে ঘর বেঁধেছে ওরা। মুসলমান সমাজে নাকি জাতি ভেদ নেই, কিন্তু ধাওয়ারা প্রায় অস্পৃশ্যদের সামিল। নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা ওদের জলপান করতে দ্বিধা বোধ করেন, অন্য সম্পর্ক তো দূরের কথা। মৃত্যুর পরেও সেই জাতি ভেদের হাত থেকে নিস্তার নেই, সাধারণ কবরখানায় ওদের প্রবেশ নিষেধ। বিলের ধারে গ্রামের শেষ প্রান্তে ওদের গোরস্থান।

সম্প্রদায়টা যেমন নিবিরোধ, তেমনি শান্তিপ্রিয়। সমাজ আর দারিদ্র্যের পেষণে প্রতিবাদের ক্ষীণতম ভাষাটুকুও কণ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। হাসানপুরের শাহু জমিদারেরা এই মধ্য বিংশ শতাব্দীতেও অষ্টাদশ শতকীয় ভঙ্গিতে জমিদারী করে চলেছে। ঘরে আগুন দেওয়া কিংবা জোর করে মেয়ে টেনে নিয়ে যাওয়াটা আজকাল বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে ধরে ধরে বেগার খাটানোটা এখনো আছে অব্যাহতভাবে। যখন তখন ঝুড়ি ভরে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে মাছ তুলে নিয়ে যাওয়াটা এখনো তারা জমিদারীর অধিকার বলে মনে করে।

কিছু বলবার জো নেই। জবাব আসে ঃ বাইরে থেকে ব্যবসা করতে এসে শালারা লাল হয়ে গেলি, দুটো মাছ নজর দিতে গা এমন কর কর করেকেন ?

লাল। লাল হওয়ার অর্থ যে কী শাহুরা নিজেরাও যে তা না জানে এমন নয়। বিন্নার ছাউনি দেওয়া ঘর বর্ষার জল আটকায়না। লজ্জা নিবারণের জন্যে দু টুকরো 'ফতা' জোটে না ঘরের মেয়েদের। মাছের সের এই যুদ্ধের বাজারের কল্যাণে দু আনা থেকে আট আনায় উঠেছে বটে, কিন্তু তা-ও বেশীর ভাগ চলে যায় দেবতা এবং উপদেবতার উপচারে। ওদের অত্যাচার জর্জর কালো মুখের দিকে তাকিয়ে বরেন্দ্রভূমির মাটি ঘৃণায় আর অপমানে সত্যি লাল হয়ে যায়।

সৈফুদ্দিন তাড়া দিয়ে বললে, বসির ভাই চুপ করে বসে আছ যে ! ঘরে যেতে হবে না ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসির উঠে দাঁড়াল। মাছ সেও বেশি পায়নি, বরং সব চাইতে কম পেয়েছে। ছেঁড়া জালটা সারানো যাচ্ছে না কদিন থেকেই, অথচ এক লাটিম সুতোর দাম কমসে কম আট গণ্ডা পয়সা।

জালের সঙ্গে মাছগুলোকে জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল বসির। দু'চারজন খরিদ্দার খালুই নিয়ে বসে আছে বিকেল থেকেই। একটু পরেই আসবে থানার কনেষ্টবল, দারোগার জন্যে দৈনন্দিন তোলা নিয়ে যাবে। তারপর সকালে বন্দরের বাজার।

বিলের থেকে কয়েক পা উঠে এসেই লালু চৌকিদারের তরমুজের বাগান। অন্ধকারে ফণী মনসার বেড়াগুলো যেন কালো কালো গোখরো সাপের মতো ফণা তুলে রয়েছে। কিন্তু লালু চৌকিদারের বাগানে তরমুজ নেই। শুধু তরমুজ কেন, লালু চৌকিদারও নেই। গত বছর বর্ষার সময় দিগদিগন্ত ছাওয়া বিলে মাছের সন্ধানে গিয়ে সে আর ফিরে আসেনি। কোথায় কোন অতলে দাম ঘাসের লতা বন্ধনে জড়িয়ে সে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সে খবর কারো জানা নেই।

বসিরের মনটা ভারাতুর হয়ে উঠল। বিশ্বাস নেই বিলকে। মেঘ ওঠে না, অথচ ক্ষ্যাপা হাওয়ায় বিল নাচতে সুরু করে দেয় আপন খেয়ালে। আধ-ডোবা শ্যাওড়া গাছের মাথায় আলাদ গোখুর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, বিন্নার শীষ দেখে যেখানে আধ হাত জল মনে হয়, সেখানে দশহাত লগি থই পায় না। ভাসমান পোড়া কাঠের গুঁড়িটা কোন মুহূর্তে যে কুমীর হয়ে উঠবে আগে থেকে কেউ তা অনুমান করতে পারে না। বসিরের অত্যন্ত ভয় হয় মাঝে মাঝে। হয়তো এই বিল একদিন তাকেও—

অন্যমনস্ক চিন্তা চকিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। ওরা ধাওয়া পাড়ার মাঝখানে এসে পড়েছে। একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে করে রোসেনা সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, পাইকার এসেছে।

—পাইকার !—বসিরের ভারাতুর মনটা বিরক্তিতে বিস্বাদ হয়ে গেল।

মাছ কিনবার খরিদ্দার যারা ছিল তারা পছন্দ মত মাছ নিয়ে চলে গেল। নগদ দাম মিলল নাম মাত্র। ধাওয়াদের কাছ থেকে নগদ পয়সা দিয়ে মাছ কিনতে গেলে ভদ্রলোকের চলে না। সাতদিন সতেরোবার হাঁটাহাঁটি করলে যে যা খুশি তুলে দেবে এই এখানকার রেওয়াজ। প্রতিবাদ নিষ্ফল, সে ঔদ্ধত্য হাসানপুরের শাহুরা ক্ষমা করবে না। বিদেশ থেকে এসে মাছের ব্যবসা করে যারা লাল হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে এটুকু উপকারও পাবে না দেশের লোক ? বাড়াবাড়ি করে যদি চালা উপড়ে বিদায় করতে কতক্ষণ ?

হালিম শাহুর খাস বরকন্দাজ পীরু মিঞা। বেঁটে খাটো চেহারা। ধমক ছাড়া কথা বলে না, ডেকে আনতে বেঁধে আনাটাই তার রীতি—বিশেষ করে ধাওয়াদের সম্পর্কে। সব চাইতে বড় বোয়ালটা জমিদারের নজরানা বলে সে কাঁধে তুলে নিলে।

নিরুপায় নৈরাশ্যে বসিরের বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। মাছটার ওপর অনেকখানি আশা ছিল তার—অন্তত দশ আনায় বিক্রী হত বাজারে। এক লাটিম জালের সুতো—

—ওটাই নিয়ে যাবে পীরু ভাই ? ছোট দেখে একটা—

পীরু থেমে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে বললে, ছোট দেখে কেন ?

—মাছ তো বেশি পড়েনি, তাই—

—তাই বলে হুজুরের মান ইজ্জত সব যাবে নাকি ? সহর থেকে মৌলানা সাহেব এসেছেন তার খবর রাখিস ?

—কে মৌলানা সাহেব ?

পীরু মিঞা বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে বললে, কে মৌলানা সাহেব ! কোথাকার বেকুব লোকরে তুই ! মস্তবড় আলেম, তিন তিনবার হজ করে এসেছেন। কাল সকালে 'ওয়াজ' হবে।

পীরু আর দাঁড়াল না।

চোখ ফেটে কান্না আসতে লাগল। সারাদিন মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলেছে ভাদ্রের রোদ। সেই কোন সকালে এক ছটাক পান্তা ভাত আর তিন সের জল খেয়ে বেরিয়েছিল, ক্ষিদেয় সমস্ত শরীরটা এলিয়ে পড়তে চাইছে। হাতে পায়ে কাঁটার আঁচড়গুলো জ্বলছে বিছুটির জ্বালার মতো, যে সব জায়গায় জোঁকে ধরেছিল, সে সব জায়গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়াচ্ছে এখনো। অথচ সে প্রাণান্তিক পরিশ্রমের এই পারিশ্রমিক ; মাঝে মাঝে মনে হয়, এ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দূরে রোহণপুর ইষ্টিশানে চলে যায় কুলি খাটতে, রোজগার যাই হোক, তার ওপরে কেউ তোলা বসাতে আসবে না।

এক মুখ হাসি নিয়ে সামনে পাইকার দেখা দিলে। একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লোকটার। হাজার গালি গালাজ করলেও আর সে হাসির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, ভেতরের কী একটা অনুপ্রেরণায় সে যেন সব সময়েই চরিতার্থ হয়ে আছে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি পাইকার।

রহমতুল্লা কিংবা করমতুল্লা জাতীয় কী একটা নাম তার আছে, কিন্তু পাইকার নামেই তার প্রসিদ্ধি এবং পরিচিতি। ধানের সময় সে দালালী

করতে আসে, পাটের মরশুমে তাকে ঘুরতে দেখা যায়, এমন কি সাগর দীঘির মেলায় খোপরা পটি বা গণিকা পল্লীর বিলিবন্দোবস্ত করতেও সে হাঁটাহাঁটি করে বেড়ায়। এক কথায় তাকে বলা যায় সর্ববিশারদ। কোথায় তার বাড়ী কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করলে অভ্যস্ত হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দেয় প্রশ্নটা। এদিককার ইতর-ভদ্র সম্প্রদায় তাকে শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে খানিকটা, তার কাছ থেকে সহরের নানারকম সংবাদ মেলে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নূতন পরওয়ানার সন্ধান সে রাখে। যুদ্ধের সব খবর সে মুখে মুখে শুনিয়ে দিতে পারে। আর জানে সিনেমার গানঃ মেরে ঝুলা ক্যায়সে ঝুলোঁ—

পাইকার বললে, কী বসির ভাই, খবর সব ভালো তো!

দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বসির বললে, আল্লা যেমন রেখেছেন।

পাইকার ভ্রূকুটি করে বললে, আল্লা! আল্লা কী করবেন। মানুষের বদমায়েসী সব। চাল-ডাল-তেল-নুন-রেজগী আল্লা নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই না?

ক্লান্ত নির্বোধ দৃষ্টিতে বসির তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাইকারের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু মনের মধ্যে গিয়ে তলোয়ারের আগার মতো খোঁচা মারে। শিরায় শিরায় মাঝে মাঝে আগুন ধরে যায় যেন। মানুষ! মানুষের চাইতে বড় শত্রু মানুষের আর কে আছে!

পাইকার বললে, ইবলিসের বাচ্ছা সব। কথা নেই বার্তা নেই, অতবড় মাছটা তুলে নিয়ে গেল! আর হালিম শাহু হরদম মদে ডুবে থেকে রাতারাতি পীর হয়ে উঠেছে আজকে। ওর বাড়ীতে বসে মৌলানা সাহেব ওয়াজ করবেন—মরি মরি!

বসির চমকে উঠল।

—ওসব কথা বলো না পাইকার! জমিদারের গাঁয়ে থাকি! যদি শোনে তা হোলে—

—ওই জন্যেই তো জাহান্নামে গেলে।

বসির চুপ করে রইল। পাইকার সত্যিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী। দুঃসময়ে কত যে সাহায্য করে বলবার নয়। এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যাওয়ার পথে যখন তখন তার আতিথ্য নেয়, আর সেই সঙ্গে আনে চাল-ডাল-তেল—প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী। এমনকি রোসেনার জন্যে রঙ্গীন শাড়ী পর্যন্ত। বসিরের ঘরে আসবার পরে রোসেনা যে দু'একখানা শাড়ী পড়েছে সে কেবল পাইকারের অনুগ্রহে। তা ছাড়া ছিন্ন মলিন দু' টুকরা ফতাই তার সম্বল।

কিন্তু ঠিক এই জিনিষটাই বসির যেন কেমন বরদাস্ত করতে পারে না। রোসেনা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রূপ এবং যৌবনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, এমন একটি মেয়ে ধাওয়া পাড়ায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর বসির নিজে কুৎসিত—অত্যন্ত কুৎসিত। বয়স তার যৌবনের সীমা ডিঙ্গিয়ে গেছে অনেক দিন। সর্বাঙ্গে পড়েছে দারিদ্র আর ম্যালেরিয়ার দন্ত চিহ্ন। কিন্তু তার সঙ্গে রোসেনার মন মরে যায়নি। চুলের কাঁটার প্রতি লোভ আছে, বন্দরের সরকারী ডাক্তার বাবুর কলেজে পড়া মেয়ে মাঝে মাঝে যখন গ্রামে বেড়াতে আসে, তখন তার রঙ বেরঙয়ের শাড়ীর দিকে তাকিয়ে লোলুপ হয়ে ওঠে রোসেনার চোখ। তার গা থেকে আসা পাউডারের গন্ধ রোসেনাকে কোন একটা অনাস্বাদিত অপরিচিত জগতের সন্ধান এনে দেয়। ইউনিয়ন বোর্ডের ইঁদারায় জল আনতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোসেনা, সারাদিন মাছ ধরে বসির যে এখন ঘরে ফিরবে সে কথা তার মনেও থাকে না।

এ সব কথা বসির জানে, ভালো করেই জানে। রোসেনাকে সে খুসী করতে পারেনি। সেই জন্যেই পাইকারের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ এবং সন্দেহে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার। কেন সে এত অনুগ্রহ করে তাকে, কী এত স্বার্থ তার? বসিরের ভাঙ্গা ঘরে রাত কাটাবার জন্যেই বা তার এ

জাতীয় আগ্রহ কেন? তা ছাড়া পাইকারের চেহারা দেখতে সত্যিই ভালো, ফর্সা রং, ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী পরে, সিল্কের লুঙ্গি। মিহি আর মিষ্টি গানের গলা, কখনো কখনো একটা বাঁশী বের করে তাতে ফুঁ দেয়। দরজার পাশে ঠুনঠুন করে ওঠে রোসেনার হাতের কাঁচের চুড়ি।

কালো মুখখানা আরো কালো করে একবার জিজ্ঞেস করেছিল রোসেনাকে, যখন তখন দরজার পাশে অমন করে দাঁড়াস কেন বল দেখি।

রোসেনা জবাব দিয়েছিল, কোথায় যাব শুনি! তোমার সাতমহলা বাড়ীর কোন্ মহলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব।

বসির আর কিছু বলতে পারে নি। সাত মহলা বাড়ী—তা বটে; খোঁচা দিতে পারে বই কি রোসেনা। একটা ভাঙা ঘর, এক টুকরো দাওয়া। ছয়টী ঋতু, আলো বাতাস আর বৃষ্টির অধিকার। বর্ষার রাত্রিতে ময়লা চটের বিছানা নিয়ে খুঁজে বেড়াতে হয় কোন দিকটাতে জল পড়ে কম। ঝুলধরা ঘরের চালে কাঁচ পোকা উড়ে বেড়ায় মাকড়সা শিকারের সন্ধানে। এখানে ওখানে ছোট বড় গর্ত, এক দিক বুজিয়ে দিলে উঁকি মারে আর এক দিক থেকে। সাপ কিংবা ইঁদুরের আস্তানা কে বলবে।

তারপর থেকে সে রোসেনাকে কোনো কথা বলেনি। নিজের দীনতায় —নিজের সর্বাঙ্গীন দীনতায় বসির নীরব হয়ে গেছে। ঘোমটা টেনে রোসেনা পাইকারের সামনে ভাত বেড়ে দেয়, এগিয়ে দেয় পান। পাইকারের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কিছু একটা প্রকট হয়ে ওঠে কি! দাঁতের উপর দাঁত কঠিন হয়ে চেপে বসে বসিরের।

পাইকার বললে, আমার কথা শোনো। লাহিড়ী বাবুদের জমিদারীতে চলে যাও। ওখানেও এমনি বিল—বড় বিল, কৃষ্ণকালীর বিল। ওই বিন্ শালারা ওদেশে গিয়ে হানা দেয়নি এখনো। তা ছাড়া বাবুরাও লোক ভালো, কোনরকম জোর জুলুম—

দীর্ঘ প্রসারিত দৃষ্টিতে বসির তাকিয়ে রইল পাইকারের মুখের দিকে।

এমন প্রস্তাব আরো অনেকবার করেছে পাইকার। কিন্তু বিশ্বাস হয় না লোকটাকে। ভুলিয়ে নিয়ে কোন আঘাটায় ভিড়িয়ে দেবে কে জানে। হয়তো নাম লিখিয়ে দেবে পল্টনের দলে। লোকে বলে পাইকারের অসাধ্য কাজ নেই।

—ওসব বলে লাভ নেই পাইকার। ভিটে ছেড়ে আমি নড়বনা কোথাও। না খেয়ে মরলেও নয়।

পাইকারের চোখে দেখা দিল নীরব অনুকম্পা, মুখের ওপর ফুট্‌ল সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা—বেশ, তাই থাকো। কিন্তু আল্লাকে দোষ দিয়োনা।

পরদিন সকালে পাইকারই বসিরকে টেনে নিয়ে গেল মৌলানা সাহেবের দরবারে। তিন তিনবার হজ করে এসেছেন তিনি, সাতটা জেলা ঘুরেও এত বড় আলেম লোক আর পাওয়া যাবে না। হালিম শাহুর বাড়ীর সামনেই বসেছে দরবার। কাঠের একখানা ছোট জলচৌকিতে আসন নিয়েছে মৌলানা সাহেব। টকটকে ফরশা রঙ—গোল মুখখানা থেকে রক্ত যেন ফেটে বেরিয়ে পড়ছে। সমবেত জনতার দিকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ আর রূঢ় দৃষ্টি ক্ষেপণ করে একনিষ্ঠভাবে মালা জপ করে চলেছেন তিনি। তাঁর পাশেই বসেছে হালিম শাহু, ধাওয়া পাড়ার অধীশ্বর, এখানকার জমিদার। মৌলানা সাহেবের সাহচর্যে নিজকে যতটা সম্ভব ধর্মপ্রাণ আর সৌম্যদর্শন করবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু তার আরক্ত চোখ আর জড়ানো কথার ভঙ্গি থেকে অনায়াসে বোঝা যায় যে, এই সাত সকালেই অন্তত একটি বোতল সে পার করে এসেছে।

হালিম শাহুই অভ্যর্থনা জানায় তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায়।

—কিরে ব্যাটা, তুই কী মনে করে ?

তীক্ষ্ণ আর রুক্ষদৃষ্টি রুক্ষতর করে মৌলানা সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন—কে এ ?

—ধাওয়া। বসির ধাওয়া। বিলে মাছ ধরে।

—ধাওয়া ?—ঘৃণায় মৌলানা সাহেবের ফরসা টুকটুকে মুখখানা বেগুনে হয়ে গেল।—মোছলমানের ব্যাটা হয়ে জেলের কাজ করিস? মরে যে তুই দোজখে যাবি।

বসির মাথা নত করে রইল। লজ্জায় এবং আতংকে মৌলানা সাহেবের কড়া মুখের দিকে সে তাকাতে পারলনা। বললে, কী করব জনাব, পেটের দায়ে—

—পেটের দায়ে! তাই বলে কাফের হয়ে যাবি? কাচ্ছু ধরিস?

—জালে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু বেচিনা জনাব, বিলিয়ে দিই।

—হুঁ, বিলিয়ে দিসনা আরো কিছু! তোবাতোবা। মুখ দেখলেও গুনাহ্ হয় তোদের। বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে তোকে পয়জার মারা উচিত।

বড় বোয়ালটার কথা বসিরের মনে এল কিন্তু বলবার সাহস হলনা।

ফিরে এসে সারাদিন চুপ করে বসে রইল বসির। সমাজ তাদের চায় না, ধর্ম তাদের অস্বীকার করে, দুঃখ আর দুর্গতির কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রত্যেকদিনের জীবন। কোনখানে কিছুমাত্র মর্যাদা নেই, মূল্য নেই এতটুকুও। কাফেরের কাজ করে, মাছ ধরে বিক্রী করে বাজারে। সেই অপরাধে জমায়েতের নামাজের সময় সকলের পেছনে চোরের মতো গিয়ে দাঁড়ায়, মস্জেদে ঢুকতে গেলে ইমাম সাহেবের চোখমুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত আর কুটিল হয়ে ওঠে।

রোসেনা জিজ্ঞাসা করলে, মাছ মারতে যাবেনা?

বসির ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে, আজ আর বেরোতে পারবনা। বড় খারাপ লাগছে শরীরটা।

রোসেনা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কিন্তু কাল চলবে কী করে?

—চলবেনা। মাদুরটা এনে পেতে দে তুই, আমি শুয়ে থাকব একটু।

পাইকার নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা। তারপর এক সময় অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাছে এসে বসল।

—সেইজন্যই বলছিলুম। চলে যাওনা এখান থেকে। মোছলমান যেখানে মোছলমানের ওপর এত জুলুম করে, সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে কিসের জন্যে?

বসির তেমনি দীর্ঘায়ত নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—এর চাইতে হিন্দুর গাঁও ভালো। তারা যাই করুক, ধর্মের ওপরে জুলুম করে না। মোছলমানের বাচ্ছা হয়ে এই বে-ইজ্জৎ সহ্য করে পড়ে থাকবে তুমি?

—মোছলমানের বাচ্ছা!—টগবগ করে উঠল রক্ত! চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল, ধকধক করে জ্বলে উঠল চোখ। পাইকারের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসির বললে, তাই যাব, আজই চলে যাব।

অত্যন্ত স্নেহভরে পাইকার তার হাত চেপে ধরলে। বললে, না, না, অত ব্যস্ত হতে কে বলেছে। ভেবে ছাখোনা দু' চার দিন।

কিন্তু দু' চারদিন ভেবে দেখবার আর দরকার হল না।

সন্ধ্যার দিকে আবির্ভাব ঘটল পীরু মিঞার। অসুস্থ মলিন রাত্রি দারিদ্র্য-জীর্ণ পাড়াটারওপরে ছায়া বিছিয়েছে। অন্ধকারে এখানে ওখানে ঝুলছে ছেঁড়া জাল, মাছের আঁশটে গন্ধ। ভিজে কাঠ আর পোড়া পাতার ধোঁয়ায় অন্ধকারটা যেন কঠিন আর শরীরময় হয়ে উঠেছে। ধাওয়া পাড়ায় সন্ধ্যায় হাঁড়ি চড়েছে। হোগলার বেড়ার ফাঁকে দেখা দিচ্ছে রেড়ির তেলের টিমটিমে আলো।

পীরু হাঁক দিলে, বসির আছিস?

বসির উঠে বসল। ভারী আর আড়ষ্ট শরীরের ভেতর স্তিমিত হৃৎপিণ্ড দুটো চমকে উঠল তার। বললে, কী মতলবে? তোলা নিতে এসেছ? কিন্তু জাল আজকে ফাঁকা, বলে দিয়ো তোমার শাহকে।

পীরু মিঞা থমকে দাঁড়াল। যতটা না অপমান বোধ করলে, বিস্ময় বোধ করলে তার চাইতে অনেক বেশি।

—খুব যে হাঁক ডাক দেখছি। রাতারাতি নবাবী পেলি নাকি! কিন্তু মাছের কথা নয়, জরুরি ব্যাপার আছে।

—কী জরুরি ব্যাপার? ভিটেয় লাঙল দিয়ে শর্ষে বুনবার মতলব আছে?

পীরু মিঞা বিস্ফারিত চোখে বললে, দরকার হলে তা তো করতেই হবে; কিন্তু না শুনেই যে ষাঁড়ের মতো চ্যাচাচ্ছিস, হয়েছে কি তোর? ভয় নেই, খুব সুখবর! হুজুর মেহেরবানি করেছেন তোকে।

—আমাকে!

—হাঁ তোকেই।—গলার স্বর নামিয়ে আনল পীরু মিঞা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা একবার চালিয়ে দিলে হোগলার বেড়ার ফাঁকে, রোসেনাকে চকিতের জন্যে চোখে পড়ে কিনা। তারপর এক নিশ্বাসে বলে গেল, তোর বিবি তো খুব খাপসুরুৎ। খেতে পরতে দিতে পারিসনে, ছেড়ে দেনা ওটাকে। হুজুরের নজর পড়েছে, তিনি বলেছেন—

—শা—লা—বসিরের গলা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল একটা অমানুষিক চীৎকার।

চমকে তিন পা সরে গেল পীরু মিঞা।—এঃ মেজাজ দেখনা। ইজ্জতে ঘা লেগেছে নাকি সাহেবের! অমন কত গণ্ডা—কানের ওপর দিয়ে শাঁ করে বিদ্যুতের মতো একটা দা বেরিয়ে গেল, একটু হলেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেত পীরুর মাথাটাকেও। আতংকে আর্তনাদ করে পীরু মিঞা পাশের বাড়ীর দাওয়ায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে সমস্ত ধাওয়া পাড়াটা এসে জড়ো হয়ে গেল বসিরের ঘরের সামনে। ভয়াল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে সে। তার চোখ দুটোর দৃষ্টি উন্মাদের মতো, তার কালো শীর্ণ দেহটা জিঘাংসার প্রতিরূপ যেন।—শয়তান হারামীর বাচ্ছা—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে রাত নেমে এল। প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে সমস্ত

ধাওয়াপাড়াটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল নিবিড়তম সুপ্তির স্নেহচ্ছায়ায়। সারাদিন পরিশ্রম, বেঁচে থাকার দুঃসাধ্য সাধনা, তার ভেতরে যা কিছু সান্ত্বনা এইটুকুই। ভোরের রঙে আকাশ ফিকে হয়ে উঠবার আগেই খানিকটা নুন-পান্তা গিলে বেরিয়ে পড়তে হবে জীবিকার সন্ধানে।

বিলের দিক থেকে হু হু করে আসছে রাত্রির বাতাস। সেই বাতাসে ভেসে আসা মরা ঘোড়াটার গন্ধ। লালু চৌকিদারের তরমুজ ক্ষেতে মনসা কাঁটাগুলো খর খর করে শব্দ করছে। বিলের তলায় দাম-ঘাসের স্নেহালিঙ্গন থেকে এই রাতে লালু চৌকিদার মাঝে মাঝে উঠে আসে কি? ঠিক ঘরের পেছনেই কি তার ডাক শোনা যায়—ঘুমের মানুষ, হো ঘুমের মানুষ, জা—গো—

বিলের ওপারে উঠল কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ। কুঞ্চিত কালো জলে কলমীর ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। মাথার ওপরে বুনো হাঁসের পাখা জ্যোৎস্নার রঙ মেখে ভেসে চলে গেল।

বসির, রোসেনা আর পাইকার এসে দাঁড়াল বিলের ঘাটে। সঙ্গে করে নেবার মতো বিশেষ কিছু নেই। একটা ছিন্ন মলিন বিছানা, একটা বদনা, দুটো কলসী, একটা কড়াই আর এক ছড়া জাল। পাইকারের কথাই সত্যি। সন্ধ্যার ব্যাপারের পরে এ গ্রামে থাকবার আর অধিকার নেই ওদের। হালিম শাহুর উনবিংশ শতকীয় রাজ্যে এ অপরাধ চূড়ান্ত। হয়তো জেল খাটতে হবে—হয়তো—সর্বগ্রাসী দাবানলের সহস্র শিখার মাঝখানে শুকনো তৃণখণ্ড।

রোসেনা কাঁদছিল। কিন্তু বসির একটা কথাও বললে না, একটি দীর্ঘ-শ্বাসও নেমে এলনা তার। মোছলমানের বাচ্ছা। শিরায় শিরায় হিংস্র রক্ত তখনও ফেনিয়ে উঠছিল। একটুর জন্য ফস্‌কে গেল হাসুয়াটা। পীরু মিঞার মাথাটাকে নামিয়ে দিতে পারলে কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকতনা আর।

একবার পিছন ফিরে তাকালো বসির। দুই পুরুষ আগে চলন বিলের

পার থেকে জমিদারের অত্যাচারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। আজ আবার তারই পুনরভিনয় চলছে। সমাজ ওদের আশ্রয় দেয়না, ধর্মের ছত্রছায়া ওদের জন্যে নয়। ঢেউয়ের মুখে মুখে দ্বীপহীন কূলহীন ওরা জীবনের অতল সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়, চারদিক থেকে হিংস্র জন্তুর করাল মুখ জেগে ওঠে ওদের গ্রাস করবার জন্যে। মহামানবের মহাসাগরে ওরা ক্ষণ-বুদ্‌বুদ।

ধাওয়া পাড়া ঘুমিয়ে আছে শান্তিতে। শান্তি নয়, নেশার আচ্ছন্নতা। এ স্বপ্ন কতক্ষণ থাকবে? আজ যে দুর্ভাগ্যের দণ্ড ওদের মাথার ওপরে নেমে এসেছিল, কাল আবার সেটা কাকে অনুগ্রহ করবে কে জানে। হয়তো ঘুমের ঘোরে ওরা স্বপ্ন দেখছে যুদ্ধ গেছে থেমে; ক্ষেতে দুলছে সোণার শীষ, মাছের ভারে জাল ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম করছে; রোসেনার গায়ে উঠেছে রূপোর গয়না, পরণে রঙীন ডুরে শাড়ী। হাঁড়িতে জীইয়ে রাখা কই মাছগুলো হয়তো এমনি করেই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে।

বসির ঠেলে নৌকাটাকে বেশি জলে নামিয়ে নিলে, তারপর কালো জল ঠেলে এগিয়ে চলল ডিঙ্গি। ছল-ছল ছলাৎ। দাঁড়ের মুখে সাদা সাদা ফেণার ফুল জ্যোৎস্নায় জ্বলে উঠছে। দূরে মিলিয়ে এল হাসানপুরের বন্দর, ধাওয়াপাড়া আর লালু চৌকীদারের কাঁটাওয়ালা ফণী মনসার ক্ষেত। এখানে ওখানে বিনেদের ভেসাল মাথা করে রয়েছে—দূর থেকে মনে হয় চাঁদের আলোয় লম্বা লম্বা ঠ্যাং ডুবিয়ে অতিকায় কতগুলো বক দাঁড়িয়ে আছে যেন। এই বিন্—এরাই ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। বসির নিরুদ্ধ আক্রোশে দাঁতে দাঁত নিষ্পেষণ করলে একবার।

রোসেনা চুপ করে বসে আছে কাপড়ের একটা ছোট পুঁটলির মতো। সেদিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে পাইকার বললে, মন খুব খারাপ করছে, না বসির ভাই?

—মন খারাপ?—নাঃ—দাঁড় টানতে টান্‌তে চাপা স্বরে জবাব দিলে

বসির। কার জন্যে খারাপ করবে মন, কিসের জন্যে? মাটিতে যাদের শিঁকড় নেই, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শিমূল তূলোর মতো যাদের জীবন, কিসের মোহ তাদের? চলন বিল, হাসানপুর, সেখান থেকে লাহিড়ী বাবুদের জমিদারী কিন্তু সেখানেও আসবে দমকা হাওয়া, আবার এমনি করেই—

বিলের এখানে ওখানে ছোট বড় চর, কর্দমাক্ত মাটি আর শনের জঙ্গল সেখানে মাথা তুলে রয়েছে। দিনের বেলা ঘুরে বেড়ায় কাদা খোঁচা আর গাং শালিক। সেই সব চরের পাশ দিয়ে ছোট বড় নালার মতো রন্ধ্র পথে জল বেরিয়ে গেছে। পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে লগির খোঁচা দিয়ে বসির নৌকাটাকে তারই একটা নালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

ঘ্যাস্ করে আটকে গেল ডিঙ্গি। তলায় কী একটা বাধা দিয়েছে। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল একটা মাছ ধরবার খাঁচা, এ দেশী ভাষায় 'ডারকিনা'। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল ডারকিনার ভেতরে প্রচণ্ড একটা ছপাছপ আওয়াজ, নিশ্চয় কোনো বড় মাছ আটকে পড়েছে। বিলের বড় বড় বোয়াল আর কালবোস এ সময়ে প্রায়ই ধরা পরে ডারকিনায়। বসির বললে, মস্ত মাছ আছে।

পাইকার জিজ্ঞেস করলে, তুলে নেবে নাকি?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলে বসির। পরের জিনিষ তুলে নেওয়ার অর্থ ই চুরি করা। কিন্তু কী হবে চুরি করলে। যারা তার মুখের ভাত থেকে ঘরের ইজ্জৎ পর্যন্ত চুরি করতে চায়, তাদের জন্যে কী অত ভালোমন্দের বিচার করা? রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল।

—তুমি নৌকাটা একটু হটিয়ে নাও পাইকার। আমি তুলে আনি মাছটাকে।

পাইকারের চোখ চক চক করে উঠল। অবগুণ্ঠিতা রোসেনা চুপ করে বসে আছে, তার মুখ দেখা যায় না। সুডোল হাতের ওপর কাঁচের চুড়ি-

গুলোতে জ্যোৎস্না জ্বলছে। পাইকারের চিন্তায় যেন ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব চলছিল।

বসির ঝুপ করে নেমে পড়ল জলে। আর সেই মুহূর্তেই লগির একটা খোঁচ্ দিয়ে পাইকার নৌকোটাকে নালা ছাড়িয়ে প্রায় বিলের মুখে সরিয়ে নিয়ে এল।

হঠাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল বসির।—মাছ নয় পাইকার, মস্ত বড় সাপ। আমাকে কামড়ে দিয়েছে। সব জ্বলে গেল পাইকার, নিশ্চয় আলাদ গোখুর।

নিরুত্তরে পাইকার নৌকাটাকে আরো দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বসির চীৎকার করতে লাগল, পাইকার, শরীর জ্বলে গেল পাইকার, তুলে নাও আমাকে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা পাইকার।

রোসেনা কেঁদে উঠল, পাইকার, পাইকার।

নৌকোটা তখন বিলের অথই জলের মধ্যে এসে পড়েছে। দাম ঘাসের আগাগুলো মাথা তুলে আছে, হাওয়ায় দুলছে গোখরো সাপের কিলবিলে এক রাশ ছানার মতো। বিলের জল ঝলমল করছে যেন বাঘের চোখ।

পাইকার শান্ত স্বরে বললে, কেঁদে আর কী করবে বিবিজান, মানুষ তো আর চিরকাল বাঁচে না।

নিশাচর

পাশ দিয়ে একটা একচক্ষু ট্যাক্সি গেল বেরিয়ে। কালো কাগজে সে চোখটাও আচ্ছন্ন—তার ওপরে এক রাশ বৃষ্টির বিন্দু জমে রয়েছে। জলে-ডোবা মানুষের পাণ্ডুর দৃষ্টি যেন। অন্ধকার চিৎপুর রোডের দু'পাশে স্প্রের মতো কাদা ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

দাঁড়িয়েছিলাম নিজেকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়েই। কিন্তু মোটরের কাদা বোমার স্প্লিণ্টারের চাইতেও দ্রুতগামী এবং দূরগামী। বেশ অনুভব করলাম, ছেঁড়া র‍্যাপারটা অভিসিঞ্চিত হয়ে গেছে।

শীতার্ত জানুয়ারীর রাত্রি। আহিরীটোলা পেরিয়ে হু হু করে গঙ্গার হাওয়া আসছে। সে হাওয়াতে আর যাই থাক, জননী জাহ্নবীর করুণার আভাস নেই এতটুকুও। ঠাণ্ডায় হাত মুখ যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্ষিদের আগুন।

সুদূর প্রাচীতে জাপানী বোমা অবতীর্ণ হয়েছে। সাইগন রেডিওতে এশিয়ার কল্যাণে অতি-মানবদের সাশ্রু শুভেচ্ছা। পীতবর্ণ কল্‌কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছে জাপানের সম্ভল দ্বীপে।

কলকাতায় ব্ল্যাক্ আউট। আলোগুলো এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি, কালো ঠোঙার ফাঁকে ক্ষীণ আলোক-চক্র অসহায় পদচারীদের দিকভ্রান্তি ঘটাচ্ছে মাত্র। আর কলকাতার অসুস্থ আকাশ থেকে আলকাতরার মতো কালো বৃষ্টির ধারা গলে পড়ছে পথের ওপর—চিৎপুর রোড রৌরব নরকের পিতৃত্ব দাবী করতে পারে। তবু অন্ধকারে পথের কাদার স্বরূপটা দেখতে পাচ্ছি না, এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

কিন্তু কী করা যায়। এই শীতের রাত্রে অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হলে নির্ঘাৎ বরফের মতো আমাকে জমে যেতে হবে। কিন্তু জমে যাওয়া চলবে না, অন্তত আজ রাত্রে কোনোমতেই নয়। পার্টির একরাশ অত্যন্ত জরুরি কাগজপত্র আছে সঙ্গে। সে কাগজগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে বাঁচতেই হবে এবং নিজেকে বাঁচাতেই হবে শান্তিরক্ষকদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি থেকে।

টং করে ঘড়ির আওয়াজ কানে এল একটা। কটা বেজেছে কে জানে। হয়তো সাড়ে বারোটা কিংবা একটা দেড়টা হওয়াও আশ্চর্য নয়। কলকাতার এই কুৎসিত পল্লীতেও অদ্ভুত স্তব্ধতা। আগে এ পাড়ায় সারারাত কুশ্রীতার উল্লাস চলত, বণিক্ সভ্যতার সমস্ত বর্বরতা মুক্তি পেত এইখানেই। কিন্তু জাপানী বোমার আসন্ন গর্জন কি মানুষের পশুত্বের দিকটাকেও রুদ্ধ করে দিয়েছে? মর্তে সত্যযুগের সত্যিই আবির্ভাব হল নাকি?

তীব্র হুইশিলের শব্দ শোনা গেল দূরে। জুতোর মচ্ মচ্ শব্দে টালা থেকে টালীগঞ্জ অবধি প্রতিধ্বনিত করে এগিয়ে আসছে কেউ। পুলিশ ছাড়া অমন বলদর্পিত পদভরে কে হাঁটতে পারে!

শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে বঁধুয়ার হাত থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। লালবাজারেই মধুযামিনী যাপন করতে হবে। কিন্তু আপাতত মনের অবস্থা প্রিয়-সঙ্গমের অনুকূল নয়, তড়িতবেগে পাশের গলিতে ভিড়ে গেলাম।

বাঃ, চমৎকার! ডাইনে বাঁয়ে, মাটিতে অন্তরীক্ষে জীবসৃষ্টির আদিম অন্ধকার; এ গলিটা কখনো জীবনে আলোর মুখ দেখবে বলে আপাতত কোনো চূড়ান্ত আশাবাদীও আশা করতে পারে না। তবু মন্দের ভালো, ঠোঙ্গাপরা আলোগুলোর মতো ছলনা করে না, নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে দেওয়া যায় রাত্রির করুণার ওপরে। কিছুক্ষণ এখানে গা-ঢাকা দেওয়া চলতে পারে।

কিন্তু সময় আর কাটে না। সারাদিন পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি,

ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা ভেঙে পড়তে চায় মাটিতে! অসহ্য শীতে হাড়গুলো যেন রায়বেঁশে নাচ নাচতে শুরু করে দিয়েছে। মুখের ওপর এ'সে বিঁধছে সূচ্যগ্র বৃষ্টির বিন্দু। পায়ের আঙুলগুলো একটা একটা করে খসেই পড়বে হয়তো।

এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না—বাঁচতে আমাকে হবেই। আশ্রয় চাই, উত্তাপ চাই। নিদ্রিত নগরীর ঘরে ঘরে উষ্ণ লেপের তলায় আর উষ্ণ নারীমাংসের উত্তাপে পূর্ণোদর মানুষ স্বপ্ন দেখছে এখন। নিয়মিত চাকুরী, নিভৃত নীড়, নিশ্চিন্ত প্রেম। বাইরে অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে সহস্র বাহু প্রসারিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঙ্কিল কামনা, তীক্ষ্ণাগ্র হিংসা। আর—আর হয়তো অতন্দ্র হয়ে প্রহর কাটাচ্ছে নতুন প্রভাতের নতুন সূর্যের তপস্যা।...

খক্-খক্-খক্। খক্-খক্-খক্। পাশের একটা বাড়িতে কে যেন কাশছে। অনেকক্ষণ ধরে কাশছে। কাশছে একটানা ভাবে—শব্দটা সন্দেহজনক। নিভৃত নীড়ের নেপথ্যে কবোষ্ণ প্রেমই শুধু মদিরতা বিস্তার করছে না তাহলে। শীত-জর্জর রাত্রির রাজপথে যে নিরাবরণ নগ্নমৃত্যু বিচরণ করছে, তার বিষাক্ত স্পর্শ অলক্ষ্য জীবাণুর আকারে ঐ সব সুখ স্বর্গে গিয়েও হানা দিয়েছে।

একটা বিচিত্র ভয়ে সমস্ত মনটা যেন শিউরে উঠল। এই বিরাট মহানগরীর হৃৎপিণ্ড দুটোকেও বুঝি ওই বীজাণুগুলো অমনি নিঃশব্দে নিঃশেষ করে চলেছে—কালো বৃষ্টির কণায় বুঝি তাঁর অন্তিম অশ্রু। পিতৃপুরুষের শতাব্দী সঞ্চিত পাপের বীজাণু—চূড়ান্ত অপমৃত্যু ছাড়া বুঝি নিস্তার নেই তার হাত থেকে।

অন্ধকারে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি। একটা গাড়ী বারান্দা, এক ফালি রোয়াক, মাথার উপর খানিকটা ছাদের আবরণ। কিছু না থাক একটু খানি শুকনো জায়গা চাই অন্তত। পরের কথা ভাবা যাবে কাল সকালে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে লাফিয়ে উঠলাম। পায়ের নীচে মানুষের একটা দেহ। মড়া নয়তো ?

কিন্তু আমার দুর্ভাবনা দূর করে দিয়ে মড়াটা কথা কয়ে উঠল। বেশ চড়া গলাতেই মড়ার সাড়া এল ঃ

—গায়ের ওপর দিয়েই মাড়িয়ে যাচ্ছ যে ? আচ্ছা লোক তো ?

—মাপ করো ভাই, অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

বিনয় বাক্যে লোকটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল।

—মাল গিলেছ কতটা ?

এত দুঃখেও হাসি এল। বললাম, মাল গেলার পয়সা কোথায় ? কিছু ধার দিতে পারো ?

লোকটা অন্ধকারের মধ্যে কর্কশ ভাবে হেসে উঠল।

—বাঃ, বেড়ে রসিক লোক তো। বোসো বোসো দোস্ত বিড়ি খাও একটা।

বললাম, শীতে জমে যাচ্ছি যে। বসলে আর উঠতে পারব না।

—শীতে জমে যাচ্ছ ?—লোকটার গলায় সহানুভূতির আমেজ এল ঃ সে কথা আগেই বলতে হয় ! পাশের গর্তটায় ভিড়ে যাও না, দিব্বি গরম আছে এখনো।

সবিস্ময়ে বললাম, গর্ত !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গর্ত। চটপট ঢুকে পড়ো, নইলে আর কেউ এসে দখল করে নেবে। মেড়ো ব্যাটারা অনেক রাত অবধি জিলিপি ভাজে, তাই ভেতরটা এখন খাসা গরম।

ব্যাপারটা বোধগম্য হল এতক্ষণে। রাস্তার পাশে খাবারের দোকানের বিরাট উনুন। তারই গর্তের মধ্যে পেট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে শীতের রাত্রি যাপন করছে মানুষ। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

মারোয়াড়ীদের দয়া আছে বলতে হবে। উনুনে কি এই জন্যই বেশি

কয়লা দেয় ওরা? চর্বি মেশান ঘি, সোপস্টোন মেশানো ময়দা আর তিসি মেশানো সর্ষের তেল। কিন্তু ধর্মশালার ধর্মচর্চায় এতটুকু ত্রুটি নেই ওদের।

একবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল। নিশ্ছিদ্র মেঘে আর নিদ্রিত নগরীর বিষাক্ত প্রশ্বাসে একেবারে গ্র্যানাইটের মতো কঠিন আর জমাট হয়ে রয়েছে। ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে—পা দুটো যেন কাঠের তৈরী। আর সামনে উনুনের লোভনীয় আশ্রয়, কয়লার উত্তাপে রাতটা কেটে যাবে দেখতে দেখতে। সামনে সদর রাস্তায় বুটের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে এখনো।

পা দুটো চালিয়ে দিলাম গর্তে। একেবারে কোমর পর্যন্ত। ভেতরের ছাইগুলো গনগন করছে, দু একটা তীক্ষ্ণ জ্বালারও অনুভূতি। কিন্তু বাইরের অসহ্য শীতের কাছে স্বর্গীয় আরাম বলতে হবে নিশ্চয়।

—ঢুকেছ তো? ব্যাস, একটা বিড়ি ধরাও এইবারে।

ঘস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। আর তারই আলোয় চোখে পড়ল সঙ্গীর মুখখানা। মাথার ধুলো মাখা চুলগুলো জট পাকানো। সমস্ত মুখে ব্রণ অথবা বসন্তের গভীর ক্ষতাঙ্ক; একটা রক্তাক্ত ক্ষতে নাকটা খসে পড়বার উপক্রম করছে, নিশ্চয়ই অকথ্য ব্যাধিতে। দুটো বড় বড় কীটদষ্ট দাঁত বেরিয়ে আছে ফাটা ঠোঁটের খোলা দরজা দিয়ে।

একটা বিড়ি এগিয়ে এল আমার দিকে: নাম্বার ওয়ান—চলবে?

নাম্বার ওয়ান—কথাটা সাংকেতিক। বিড়িই বটে, কিন্তু তামাকের নয়, গাঁজার।

বললাম, না চলবে না।

—ধেৎ দোস্ত, ভারী বেরসিক তুমি। বোতল টানতেই শিখেছ খালি।

চুপ করে রইলাম। বুকের কাছে কাগজগুলো খস খস করছে। এক রাশ নিষিদ্ধ ইস্তাহার। জগতের বঞ্চিত জনগণ, জাগো তোমরা।

হাতুড়ির মুখে পুঁজিবাদকে গুঁড়ো করে লুটিয়ে দাও মাটিতে। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারাদের কিছু আর হারাবার নেই।……

টিপ টিপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে মুখে। গাঁজার ধোঁয়া আর পচা ঘায়ের গন্ধ যেন নিশ্বাস আটকে আনছে। বন্ধুর সংসর্গ লোভনীয় বোধ হচ্ছে না। গণ-দেবতার রূপ।

—তারপর খবর কী দোস্ত? নেশা ভাঙ যে করো না, সে তো চেহারাতেই মালুম হচ্ছে। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ নয় তো?

বললাম, যা বোঝো।

—বেশ, বেশ, দলে এসো তা হলে।—লোকটা খুশি হয়ে উঠল: কী করেছিলে? খুন? চুরি? হাত দিয়েছিলে মেয়ে মানুষের গায়ে? তা চুপচাপ পড়ে থাকো এখানে। শীতের রাত্তিরে কোন্ ব্যাটার সাধ্যি যে খুঁজে বার করবে তোমাকে।

সময় গড়িয়ে চলেছে। ফুটপাথের ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে শুয়ে আছি, ছেঁড়া র‍্যাপার কান দুটোকে রক্ষা করছে হিমেল হাওয়ার আক্রমণ থেকে। শুধু মাঝে মাঝে দূরের সেই বাড়িটা থেকে ভেসে আসছে যক্ষ্মারোগীর কাশির শব্দ।

টিপ্-টিপ্-টিপ্। টপ্-টপ্-টপ্। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে সুরু হয়েছে, চারদিক থেকে কাদার বিন্দু ছিটকে আসছে গায়ে। ঝম ঝম শব্দে জোরালো বৃষ্টি নেমে এল।

আহত কুকুরের মতো সঙ্গী আর্তনাদ করে উঠল।

উনুনের ভেতর থেকে পা দুটোকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম। এমন অসহায় ভাবে ভেজা চলবেনা কোন মতেই। নিজের জন্যে নয়—কাগজ-গুলোকে অন্তত রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু রাত শেষ হবে কখন! নিদ্রিত কলকাতার বুকে এই বীভৎস অন্ধকার—এ যেন কত যুগ যুগ ধরে অনড় আর অটল হয়ে আছে। সন্ধ্যার ছদ্মবেশে মৃত্যু এসে যেন মহানগরীকে গ্রাস

করেছে—এই ঘুম, প্রাসাদপুরীর এই অন্তিম তন্দ্রা আর কখনো ভাঙবে না।

কী অমানুষিক অন্ধকার! হোঁচট খাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে তীব্র একটা যন্ত্রণাবোধ।

অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের একটা তীক্ষ্ণ শিখা দিকে দিগন্তে ভয়াল সরীসৃপের মতো খেলা করে গেল। প্রেত-রাজ্যের মতো তমসাচ্ছন্ন গলিটা মায়াপুরীর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। বজ্রের গর্জনে দুপাশের বাড়িগুলো ঝন ঝন করে কাঁপতে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

সামনে আলোকিত একটা রোয়াক। বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে। এই রাত্রে, এমন গলিতে এখনো মানুষ জেগে আছে নাকি? এখনো কি কেউ কারো জন্যে প্রতীক্ষা করে?

ভাববার আর সময় নেই। চুঁইয়ে বৃষ্টির জল ভেতরের কাগজপত্রগুলোকে সব ভিজিয়ে দেবার উপক্রম করছে। বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লাম আলোকিত রোয়াকে।

বিবর্ণ সবুজ রঙের স্কার্ফ জড়ানো বিবর্ণতর একটি মেয়ে। মুখের খাঁজে খাঁজে শাদা পাউডারের প্রলেপ। সাদর আমন্ত্রণ জানালে, এসো এসো ভিতরে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই ভেতরে চলে এলাম।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটি আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কেরোসিনের আলোয় এতক্ষণে আমাকে সম্পূর্ণ দেখবার সুযোগ পেয়েছে সে। কোমর পর্যন্ত উনুনের ছাই। গায়ের ময়লা ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভিজে সপ্ সপ্ করছে।

মেয়েটার শ্রীহীন মুখ আশংকায় আরো বিশ্রী হয়ে উঠল। চেহারা দেখেই সহজাত সংস্কার বশে সে টের পেয়েছে আমি তার খদ্দের নই।

—কী চাই?

জবাব না দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরে খাট নেই। এক পাশে দুটো টিনের তোরঙ্গ, সামান্য জিনিষপত্র, আলনায় ছেঁড়া ময়লা শাড়ী। সমস্ত মেঝেটা জুড়ে অপরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা রয়েছে, তার মাঝখানে ফর্সা একটা তাকিয়া আর একটা হার্মোনিয়াম। এক কোণে এক জোড়া তবলা-ডুগি, ঘুঙুর।

নিরুত্তরে বিছানায় বসে পড়লাম। আর দাঁড়াতে পারছি না। ঘরের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ উত্তাপ, নেবা-উনুনের আগুন নয়। হাওয়াটা শুষ্ক এবং মধুর—দৈহিক উপস্থিতির নিবিড়তায় ঘনীভূত। শীতে শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করছিল, বিছানাটার ওপর গড়িয়ে পড়ি।

মেয়েটার মুখেও বোধ করি কথা জোগাচ্ছিল না। কালো এবং কুৎসিত। বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে হয়তো, হয়তো তার চাইতেও বেশি। জৈব-প্রেরণা কতখানি অত্যুগ্র হয়ে উঠলে যে মানুষ নিশীথ-নাট্যে এই মেয়েকে নায়িকা করতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। সমস্ত চোখে-মুখে রেখা আর কালি—অসংখ্য লালায়িত সরীসৃপের গতিরেখায় যেন চিহ্নিত।

—কি চাও তুমি?—জিজ্ঞাসু ভীত-দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত্রির আগন্তুকেরা সকলেই তার পায়ে প্রণয়-অর্ঘ নিবেদন করতে আসে না। মদের গ্লাসে তারা অলক্ষ্যে মিশায় স্ট্রীকনিনের গুঁড়ো; নেশা বেশী ঘন হয়ে উঠলে গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে নির্বিবাদে সব কিছু নিয়ে সরে পড়ে। অবিশ্বাস আর অপমৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দুতে টলমল করছে ওদের জীবন। পদ্মপাতায় শিশির।

বললাম, কিছুই নয়, খানিকক্ষণ আশ্রয় চাই শুধু।

—আশ্রয়!—মেয়েটার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল: ফেরারী? পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি?

হাসলাম।

—কী করেছিলে?

বললাম, বিশেষ কিছু নয়। সঙ্গে কতগুলো কাগজ আছে, তা ছাড়া আর কোন অপরাধ নেই।

দেখতে দেখতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এতক্ষণে সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেছে, একটা নিবিড় আন্তরিকতায় ছলছল করে উঠেছে ওর চোখ।

—স্বদেশী?

—অনেকটা তাই।

—এই শীতের রাত্রে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ ভদ্রলোকের ছেলে! গায়ে একটা গরম জামা নেই, কিছুই নেই—

বললাম, রাত দশটার সময় হঠাৎ বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল, তাই পাচীল টপকে বেরিয়ে পড়েছি।

একটা গভীর উৎকণ্ঠা আর স্নেহের স্বর কানে এল: নাও, নাও, শুয়ে পড়ো ওখানে। এই লেপটাই জড়িয়ে নাও গায়ে। কোনো ভয় নেই।

বললাম, আর তুমি?

—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবেনা।

সত্যিই তো, সে ভাবনা ভেবে আমি কি করতে পারি। এই মুহূর্তে আমার লেপের প্রয়োজন, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমাকে বাঁচতে হবে, অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত এই কাগজগুলোর দায়িত্ব বহন করতে হবেই। শুধু নিজের জন্যই আজকে আমার জীবনের মূল্য নয়, বহুর জন্যে—বৃহত্তর পৃথিবীর, সমস্ত জগতের জন্যে।

লেপের আকর্ষণটা তীব্র মনে হচ্ছে। একবার তার কোমল স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে তলিয়ে গেলে সকাল আটটার আগে আর ঘুম ভাঙবেনা। সমস্ত শরীরে যেন শতাব্দীর তন্দ্রা আর ক্লান্তি এসে ভেঙে পড়েছে। এই বারবণিতার ঘরে, অসংখ্য ব্যাভিচারের স্মৃতি-কণ্টকিত এই শয্যায়, উজ্জ্বল দিবালোকেও আশ্রয় নেবার কথা ভাবলে দেহ-মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষাচঞ্চল এই শীতের রাত্রে আজ সব কিছুরই অর্থ বদলে গেছে। নিশীথ

নগরীর এই ভয়ার্ত ক্লিন্নরূপ, শ্বাসরোধী অপমৃত্যুর মত নিষ্প্রদীপের অন্ধকার। সহস্র শতাব্দী ধরে যে গোপন ব্যাধিটা বিষাক্ত হয়ে উঠছিল, আজ তার চরম আত্মপ্রকাশ। এরই মাঝখানে আজ পারিপার্শ্বিক জগৎটা যেন প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে তার সত্য এবং আদিম অমার্জিতরূপে। আলো, প্রসাধন আর ঐশ্বর্যের প্রচ্ছদপটের নীচে রূপাজীবা নগরীর আসল চেহারা—নিভৃত মর্মজগৎ।

—নাও, শুয়ে পড়ো তুমি। আমাদের বিছানায় শুতে হয় তো ঘেন্না করবে, কিন্তু ফুটপাথ কিংবা মিঠাইওলার উনুনের চাইতে খারাপ নয় নিশ্চয়ই।

মেয়েটি বিছানার একপাশে এসে বসল। তার বিবর্ণ বিকৃত চেহারায় দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি। সমস্ত চোখে মুখে যে ক্ষুধা তার প্রকট হয়ে উঠেছে সে ক্ষুধা অন্নের। জৈবকামনা নয়, মদিরাক্ষী বারবধূর লাস্য-বিভ্রমও নয়। চকিতে মনে হল স্নেহে আর করুণায় তার দীপ্তিহীন চোখ দুটি উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু—সমস্ত ভাবনার ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। স্বার্থপরতা বই কি! আজ রাত্রে খরিদ্দার না জুটলে কাল হয়তো তাকে উপবাস করতে হবে। ঘরের চারিদিকে যে দারিদ্র্য লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় আত্মপ্রকাশ করছিল, তার নগ্ন-রিক্ততা যেন আমাকে আঘাত করতে লাগল। এখানে রাত্রিযাপন করবার অর্থ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। অনিচ্ছুক আড়ষ্ট পা দুটোকে একত্র করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু আশ্রয়দাত্রীর স্বরে প্রকাশ পেল ব্যগ্র উৎকণ্ঠা: উঠলে যে?

—নাঃ, যেতে আমাকে হবেই। তোমার উপকার ভুলব না কখনো—শ্লথ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বুকের কাছে খস্ খস্ করে উঠল রিপোর্ট আর ইস্তাহারগুলো।

—এই রাত্রে, এই ঠাণ্ডায় না গেলেই চলত না কি?

মুখ ফিরিয়ে হাসবার চেষ্টা করতে হল : বিপদে পড়লে আবার না হয় ফিরে আসব।

ক্ষণিকের একটা ছায়াছবির মত দেখলাম আলোকিত দরজার পটভূমিতে বিবর্ণ স্কার্ফ জড়ানো পণ্য নারী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময় কতদিন দেখেছি দিদিকে দরজায় ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আবার সেই অন্ধকার আর গলির পথ। বাইরে হিমেল রাত্রির কবল থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, পলাতক শিকারকে মুঠোর মধ্যে খুঁজে পেয়ে শীতের বাতাস যেন নিষ্ঠুর ভাবে দস্তুর হয়ে উঠেছে। দুটো বরফের টুকরো কানের ছিদ্র দুটোকে আটকে বসেছে, নাক দিয়ে খানিকটা রক্ত নেমে আসবার উপক্রম করছে বোধ হয়। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে দুঃসহ যন্ত্রণা।

আকাশে তারা দেখা দিয়েছে দু' চারটে। উজ্জ্বল নয়, হাল্‌কা মেঘ আর কুয়াশায় এখনো আচ্ছন্ন। লোহার রেলিংগুলো একটা বড় বাড়ীর গারগয়েলের মুখ দিয়ে ছড়্ ছড়্ করে জল আছড়ে পড়ছে। গেটের কাছে ঢাকনা দেওয়া একটা আলো ; তারই অস্পষ্ট দীপ্তিতে দেখা যাচ্ছে ভেনাসের একটা নগ্ন মূর্তি, অযত্নে তার সর্বাঙ্গে পাত্‌লা নীল শ্যাওলার একটা আস্তর পড়েছে। এই অন্ধকার গলির সঙ্গে অন্ধকার মাখা শ্রীহীন বাড়ীটা অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে গিয়েছে।

সামনে একটা বড় রাস্তা। শোভাবাজার স্ট্রীট নিশ্চয়। বড় বড় বাড়ীগুলো যেন অন্ধকারের দুটো অসমতল কালো প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে। বৃষ্টিতে ভেজা প্রশস্ত পথ ক্ষীণ আলোতে জলজল করছে।

ঝন্ ঝন্ করে একটা প্রবল শব্দ এল কাণে। সমস্ত শরীরটা মুহূর্তে ছম্ ছম্ করে উঠল চকিত আশংকায়। নিদ্রিত কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বোধ হয় ছড়িয়ে গেল শব্দটা।

নিশাচরের মতো চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে দেখলাম এমন রোমাঞ্চকর নয় ব্যাপারটা। তিন চারটে কুকুর এক সঙ্গে বোধ হয় একটা ডাস্টবিনের ভেতর আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সমবেত চেষ্টায় সেটা আছড়ে পড়েছে। পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তার উপর দিয়ে দু' তিনটে কি বড় বড় দৌড়ে গেল এক পাশে, বোধ হয় ড্রেনের ঝাঁজির মধ্যে গিয়ে নামল। ইঁদুর।

দূরে চিৎপুর রোড দিয়ে একটা মোটর গ্রে ষ্ট্রীটের পথে বেরিয়ে গেল। হয়তো ডাক্তারের গাড়ী, হয়তো সোণাগাছি থেকে আনন্দ লুণ্ঠন করে ফিরলে কেউ; হয়তো—

দপ্ দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল। একটা বাড়ীর গাড়ী বারান্দার নীচে। রাত্রির বুক চিরে যেন এক ঝলক টাটকা রক্ত পড়ল ছড়িয়ে। আগুনের আলোয় পাঁচ সাতটা মাথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—একদল ভিখারী। ওদের দিকেই এগিয়ে চললাম, হাত পা দুটোকে অন্তত সেঁকে নেওয়া চলবে।

চমৎকার আসর জমিয়েছে। গোল হয়ে আগুনটাকে ঘিরে বসেছে ওরা, ছেঁড়া কম্বল আর নোংরা কাপড়-চোপড়ের বাইরে অনাবৃত অঙ্গগুলোকে আগুনে সেকে নিচ্ছে। আর হল্‌দে ন্যাকড়া জড়ানো একটা ছোট কল্‌কি বৃত্তটির ভেতর পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

—আ যাও ভেইয়া, বৈঠে যাও। তাম্‌কু পিব?

বললাম, তাম্‌কু তো নেহি পিতা ভেইয়া, জাড়্‌কে লিয়ে থোড়া আগ্‌কা জরুরৎ—

—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আগ্‌তো হ্যায়ই হিঁয়াপর—

লোকগুলি আমার মুখের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোন প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করবার কিছু নেই। প্রতি রাত্রে এমনিতর অসংখ্য মানুষকে দেখেছে তারা, দেখেছে নিশীথ নগরীর রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য অভিনয়। শীতের রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তারা যে স্তরের লোকই

হোক না কেন, নিঃসন্দেহে তাদেরই সগোত্র। দুঃখ এবং রিক্ততার পটভূমিতে সমস্ত মানুষ একাকার হয়ে গেছে ; ভিক্ষুক আর ভবঘুরে, চোর আর বার-বণিতা, গুণ্ডা আর কুলত্যাগিনী।

কোথা থেকে কাঠ-কুঠরো আর কাগজের টুকরো জোগাড় করেছে ওরাই জানে, আগুনটা জ্বলছে মন্দ নয়। হাত পা গুলো সেঁকে নিলাম। র‍্যাপারটার জল গায়ের উপর অনেকটা প্রায় শুষে নিয়েছিল, বাকীটুকু আগুনে শুকিয়ে এল। পৌষের রাত্রে গাড়ী বারান্দার তলায় ভিখারীদের এই অগ্নিকুণ্ডটা যেন গ্রেট্ ইস্টার্ণ হোটেল !

আগুনের আলোয় সকলের মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। অদ্ভুত সব মুখ—একটা থেকে আর একটার যেন পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। রাশি রাশি চুল দাড়ি, ঝুলে পড়া চামড়া, ঘোলা চোখ। মনে হল যেন যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান পার হয়ে গুহাবাসী একদল আদিম মানুষ এই গভীর রাত্রে কলকাতার ফুটপাথে এসে দেখা দিয়েছে ; সেই আদি মানবের মত আগুনের কুণ্ড জেলে বসেছে ওরা ; সামনে পুড়ছে নিহত শিকারের মাংস সভ্যতার সমস্ত বিবর্তনকে অস্বীকার করে শ্রেণীহীন প্রথম সমাজ এসে আবির্ভূত হয়েছে নিরঞ্জন বর্বরতায়।

চাপা স্বরে কী আলোচনা করছে ওরা। একটু উৎকর্ণ হয়ে উঠতেই কথাগুলো কাণে এল। ভাবটা এই রকম :

—কলকাতায় বোমা তাহলে গিরবেই ?

—গিরবে বই কি। নইলে আর এত আন্ধার কেন চারদিকে ? হাওয়াই জাহাজ এসে বোমা ফেলে দিয়ে যাবে, ঘরবাড়ী বিলকুল উড়িয়ে দেবে।

—বিলকুল উড়িয়ে দেবে ? মনুমেণ্ট, চৌরিঙ্গী, সরকারী দপ্তর, লাট সাহেবের কোঠী—তামাম ?

—তামাম।

—উঃ, তবে ত ভয়ানক।

—আলিপুরের হাজতটা উড়িয়ে দেয় আগে? আর টাঁকশাল? আর ক্লাইভ স্ট্রীট? এত্না এত্না রূপেয়াতে সব মরচে ধরে গেল' আর জিন্দা আদমি ভুখে মরে যাচ্ছে।

হাসি এল। টাকায় মরচে ধরে যাচ্ছে আর না খেয়ে মরচে ক্ষুধার্ত মানুষ। স্বর্ণকুলীন সভ্যতার এই-ই বাস্তব রূপ। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত বুভুক্ষুর আর্তনাদ এসে ধ্বনিত হয়েছে এই দুটি কথার মধ্যে। একথা কাউকে শোনাতে হয় না, বোঝাতে হয় না, এ গণদেবতার স্বতোৎসারিত বাণী। তাই রক্ত পতাকাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে দিকে দিকে কোটি বজ্রমুষ্টি।…

কিন্তু আর বসা উচিত নয় এক জায়গাতে। বঁধুয়ার কথা ভুললে চলবে না। ব্ল্যাক আউটের তমাল-কুঞ্জে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাধিকার সন্ধানে, চোখে চোখ মিললে আর নিস্তার থাকবে না। ভিখারীদের দলে যতই ভীড়ে যাই না কেন, তাঁর অভ্যস্ত দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারব না। তার উপর যে অভিজ্ঞান সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছি, তাতে কতদিনের জন্য যে মিলন-বাসর রচনা হয়ে যাবে, সে সম্পর্কে আগে থেকে কিছু না ভাবাই ভালো।

বাঁশী শোনা গেল। প্রাণনাথ গ্রে স্ট্রীটের মোড়েই আছেন। এই দারুণ শীত আর দুর্যোগেও তাঁর কর্তব্য প্রেরণা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম দূরে সেই টালা থেকে টালীগঞ্জ-প্রকম্পী দিগ্বিজয়ী পদধ্বনি।

উঠে পড়লাম। শরীরটাকে অনেকখানি চাঙ্গাবোধ করছি এখন। বরফে হিম হয়ে যাওয়া শিরা স্নায়ুগুলোর মধ্যে যেন আবার গরম রক্ত বইতে সুরু হয়েছে। পেটে অতি তীব্র ক্ষুধার অনুভূতিটা এখন আর কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না, সারা রাত পশুর মতো দাপাদাপি করে বোধ করি এখন সেটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পা দুটো কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়েছে, এখন আবার কিছুটা পথ পাড়ি জমানো চলবে।

মসৃণ ফুটপাথটা কী অস্বাভাবিক শীতল। যেন বরফের তৈরী। কোথায় যেন হাইড্রাণ্ট্ দিয়ে গঙ্গার ময়লা জল উছলে উঠছে, অন্ধকারে শুনছি তার

ঝির্ ঝির্ কল্ কল্ শব্দ। রাত বোধ করি আর বেশি নেই। আকাশের কালির রঙ জোলো হয়ে আসছে, রথতলা ঘাটের ওপার থেকে গঙ্গার স্পর্শ আরো সুতীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। দু' পাশের বড় বড় বাড়িগুলোর ওপর দেখতে পাচ্ছি উড়িয়ে দেওয়া তুলোর মতো অস্পষ্ট কুয়াশার রাশি এসে জমছে, ম্লান প্রভাতের সূচনায় কালো ঠোঙ্গায় অবগুণ্ঠিত শাদা আলোগুলোতে দেখা দিয়েছে লালাভা।

স্ট্র্যাণ্ড্ রোড। সামনে দিয়ে অপরিচ্ছন্ন রেল লাইন, একটু দূরেই দু' তিনটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাটগুদামের সঙ্গে একাকার হয়ে। তার ওপারে 'চিরকলতান উদার গঙ্গা, বয়ে চলেছে প্রায়ান্ধকারে, পোস্তার গায়ে শোনা যাচ্ছে জোয়ারের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। রথতলা ঘাটে কালো কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে পোর্ট কমিশনারের কুলি, রিক্সওয়ালা আর ভবঘুরে পশ্চিমার দল। স্টিমারের লাল-নীল আলো দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ ঘাটে।

—কোন্ হ্যায় রে—

চমকে উঠলাম। অন্ধকারে কে কাকে চ্যালেঞ্জ করছে। হয়তো গুম্‌টির গেট-কীপার, হয়তো মালগুদামের পাহারাওয়ালা। রাজপ্রহরী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

দ্রুত এগিয়ে চললাম। নোংরা কর্দমাক্ত পথ। ছক্কড় লরী আর গোরুর গাড়ির কল্যাণে নুড়িগুলো মাথা তুলে রয়েছে, আহত বুড়ো আঙুলটায় বিলক্ষণ চোট লাগল একটা। গঙ্গার হাওয়ায় উত্তর মেরুর আত্মীয়তা।

কাশী মিত্রের ঘাট। একটা লাল শিখা আর মাংস-পোড়া হলদে ধোঁয়া প্রাচীরটাকে ছাড়িয়ে উঠছে। কার যেন নশ্বর দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে পঞ্চভূতে। যাক—বাকী রাতটুকুর জন্যে ভদ্ররকমের একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। বিবাগীর পক্ষে শ্মশানের চাইতে ভালো জায়গা আর কী আছে।

কোন্ অনাত্মীয় দুর্ভাগা পুড়ছে কে বলবে। শ্মশানে জনমানব নেই। শুধু নিঃসঙ্গ একজন ডোম বাঁশ দিয়ে চিতাটাকে ঝেড়ে দিয়ে নিদ্রাজড়িত চোখে চলে গেল, মড়াটার আর বেশি বাকী নেই। সামনে এখনো অন্তত

তিন ঘণ্টা রাত্রি—এ সময়টুকু সে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে কম্বলের উত্তপ্ত আরামের মধ্যে।

চিতাটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠুঁটো হাত পা আর আকারহীন একটা বিকৃত বস্তু, মানুষ বলে চেনা যায় না; জ্বলন্ত কাঠকয়লার নীচে পোড়া শূয়োরের মতো দেখাচ্ছে। আচমকা মনে পড়ে গেল দক্ষিণ-সমুদ্রের নর-খাদকেরা শ্বেতাঙ্গদের কায়দায় পেলে বড় শূয়োর বলে পুড়িয়ে খায়!

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে দগ্ধপ্রায় মৃতদেহ, শ্মশানের গন্ধ, গঙ্গার কলোচ্ছ্বাস। হঠাৎ চোখে পড়ল চিতাটার এক পাশেই একটা শূন্য দড়ির খাটিয়া। ওই মড়াটাকে বয়ে আনা হয়েছিল নিশ্চয়।

জয় ভগবান! এতদিন ভদ্রলোককে ভুলেছিলাম, আজ তাঁর অপার করুণা দেখে মনে নির্ঘাৎ আস্তিক-বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন চমৎকার আগুনের পাশে এমন রাজশয্যা! এ যে লাটসাহেবের গদীকেও লজ্জা দেয়। নির্জন এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে মনে হল আমিই সম্রাট আলমগীর—আর এ হচ্ছে আমার মোতিমহল। 'হমেনস্ত্ হমেনস্ত্ ওয়া হমেনস্ত্!' জীবন্তের কলকাতাকে ভয় করি, কিন্তু মৃতের কলকাতার অসীম দাক্ষিণ্যকে অস্বীকার করবে কোন্ অকৃতজ্ঞ!

ছেঁড়া র‍্যাপারটা জড়িয়ে খাটিয়াটার ওপরে শুয়ে পড়লাম। চিতার উত্তাপটা কী চমৎকার লোভনীয়! মড়াপোড়া গন্ধটা যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করছে। আর এমন জায়গায় বঁধুয়ার পদার্পণও যে সহজে ঘটবে না, সঙ্গতভাবে এ আশা করা যায়। পাথরের মতো ভারী হয়ে দেহ আর চেতনার উপরে ঘুম নেমে এল।···

—উগ্র হরিধ্বনিতে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অজস্র লোক আর দুটো মড়া এসে জমেছে। কড়া রোদে জাগ্রত জীবন্ত কলকাতা—কাশীমিত্রের ঘাটে স্নানার্থিনীর ভিড়। বেলা সাড়ে আটটার কম হবে না। এইবার মহানগরীর পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

সৈনিক

ডুম ডুম ট্র্যুম—

সাঁওতালদের নাগাড়া বেজে উঠল। বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত আকাশে অনেক দিন পরে জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে।

আশ্চর্য দেশ। বাঙলা দেশই বটে, কিন্তু বর্তমানের নয়। মৃত বাঙলার অস্থিকংকাল রাশি রাশি ইট-কাঁকরে ভাঙা জাঙ্গাল আর মজা দীঘিতে ছড়িয়ে রয়েছে, একটা বিরাটের মহাশ্মশান যেন। চারদিকে ধূ ধূ করছে অনুর্বর মাঠ, বিরল বসতি গ্রামগুলোর ওপর দারিদ্র্যের নগ্নতা; মাথার ওপর ক্ষুধার্ত চিল চীৎকার করে উড়ে যায়; আর লাল মাটির ছোট বড় অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাটকায় শঙ্খিনী সাপ পেট টেনে টেনে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে।

ডুম ডুম ট্রুম ট্রু—সাঁওতালদের নাগাড়া বাজতে লাগল। যাযাবর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। যেখানে মিলবে নির্জনতা, মিলবে খাদ্য। বিমুখ প্রকৃতিকে ওদের ভয় নেই এতটুকুও। মাটির বুক থেকেই ওরা ছিনিয়ে আনতে পারে প্রতিদিনের উপকরণ, বুনো ওল সেদ্ধ করেই ওদের এক বেলা চলে যায়, গো-সাপের পোড়া মাংসেই ক্ষিধে মেটে। নাগাড়া বাজিয়ে ওরা বাঘ মারে আর যুদ্ধ করে, মাদল বাজিয়ে ওরা নাচে, আর বাঁশী বাজিয়ে ওরা ভালবাসে।

মৃত বাঙলার বুকে বহুদিন পরে জীবন্ত মানুষের দল এসে দেখা দিয়েছে। এই শ্মশান ওদের ভালো লেগেছে, এখানেই ঘর বাঁধবে ওরা। মজে যাওয়া দীঘিতে ওদের চোখে পড়েছে কুমীরের ছায়া; ঘাস বনের ভেতর থেকে বুনো শুয়োরের গায়ের উগ্র গন্ধ ওদের নাকে লেগেছে; শিকড়ে শিকড়ে পাথর জড়ানো বট গাছের কোঠরে ওরা দেখেছে লকলকে গো-সাপের জিভ।

সামনের বড় মাঠখানা পেরিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গেলে কুমারদহ গ্রাম। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে এসে দেবীকোট রাজবংশের কে একজন এখানে আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর উত্তর-পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী এখানকার জমিদার।

এই কাহিনীর যখন আরম্ভ, তখন চন্দ্র চৌধুরীর বয়স অতিক্রম করেছে পঞ্চাশের সীমারেখা। টকটকে লাল চেহারা, রক্তের চাপে সমস্ত মুখ যেন ফেটে পড়ছে। কপালের দু'পাশে শিরা দু'টো অত্যন্ত স্ফীত। বাঁ-হাতে তিনটে আঙুল নেই। হিজল বনে একবার বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তিনি—বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে কুস্তিতে লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শোনা যায় আছাড় মেরেই বাঘটাকে তিনি বধ করেছিলেন—এমনি শক্তিমান পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী।

কিন্তু একক চন্দ্র চৌধুরী অসম্পূর্ণ। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটি প্রাণী জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য হয়ে—সে নীল বাহাদুর।

হাতী। কাল বৈশাখীর জমাট ঘন-নীল মেঘের মতো তার চেহারা—নীল বাহাদুর নাম তার সার্থক। আসামের পাহাড়ে নিজের দলবলের মধ্যে সে সে ছিল গজেন্দ্র। শুঁড়ের টানে আকাশ-ছোঁয়া সরল গাছগুলোকে মড় মড় করে দেশলাইয়ের কাঠির মতো নামিয়ে দিত সে, ভরা বর্ষায় সানন্দে অবগাহন করত তরঙ্গ-মাতাল ব্রহ্মপুত্রের জলে। বসন্তে তার মদস্রাবের গন্ধে পাহাড়ে পাহাড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচারিণী হস্তিনীর দল।

তারপর যূথপতির পায়ে একদিন শৃঙ্খল পড়ল। তখন ফাল্গুন মাস। মহুয়ার গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে গেছে—সমস্ত দিন বপ্রক্রীড়া করেও এতটুকু স্বস্তি নেই নীল বাহাদুরের। স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরীর মতো সামনে এসে দেখা দিলে অপরিচিতা হস্তিনী, নীল বাহাদুর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। কয়েকদিন পরে যখন চমক ভাঙল তখন আর উপায় নেই—'কুনকি'র ছলনায় সে খেদার মধ্যে বন্দী।

অসহায় আক্রোশে কলা গাছগুলোকে উপড়ে, ধারালো দাঁতে মাটিকে বিদীর্ণ করে সে পাগলের মতো ছুটোছুটি করলে। তারপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে ধীরে ধীরে সমস্ত বীর-বিক্রম তার শান্ত হয়ে এল। নীল বাহাদুর আজ চন্দ্র চৌধুরীর বাহন। মাহুতের নির্দেশে সে সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, ডাঙসের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে তার মন। পায়ের নীচে পাহাড়ীদের গ্রামগুলোকে একদা দলে চুরমার করে দিয়েছে—সে সব এখন গত জন্মের স্মৃতি মাত্র।······

বাইরের দেউড়িতে তখন নীল বাহাদুরের পিঠে হাওদা কষা চলছিল। চন্দ্র চৌধুরী যাচ্ছেন মহালে। দেউড়ির সামনে জমেছে মাঝারি গোছের একটা ভিড়। ঠিক এমনি সময় মৃদু-গম্ভীর মাদল বেজে উঠল দূরে।

চন্দ্র চৌধুরী চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, শব্দটা কিসের ?

সদর নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জে খবরটা আগেই পেয়েছিলেন। বললেন, রাজমহলের গঙ্গা পেরিয়ে সাঁওতাল এসেছে একদল।

—সাঁওতাল ? কি চায় ওরা ?

—পালগ্রামে ঘর বেঁধে থাকবে, তারই অনুমতি চাইতে এসেছে।

—পালগ্রামে ? চন্দ্র চৌধুরীর চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল : সেখানে থাকবে—খাবে কি ? মাটিতে তো লাঙ্গল বসবে না।

—খাবে কী ? নৃসিংহ মুখুজ্জে হাসলেন : ওদের খাবার ভাবনা আছে নাকি হুজুর ? পালগাঁয়ের টিলায় তো আর সাপের অভাব নেই, তাই মেরেই পুড়িয়ে খাবে।

—সাপ খাবে ?

—খাবে বই কি। সাপ তো সাপ হুজুর, বাঘের মাংস পেলে তাও কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। বলে কী, জানেন ? বাঘে যখন আমাদের মাংস খাবে, তখন আমরাই বা বাঘকে ছেড়ে দেব কেন ?

অকৃত্রিম আনন্দে চন্দ্র চৌধুরী হেসে উঠলেন।

বললেন, এ একটা কথার মতো কথা বটে। হাঁ, এরাই পালগ্রামের যোগ্য বাসিন্দা।

সাঁওতালের দলটি তখন ছোটখাটো একটা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে বাজনা। তবে এবার আর নাগাড়াটিকারা নয়, মাদল। ধিতাং তাং ধিতাং তাং। এটা ওদের বিজয়োৎসবের আনন্দ উল্লাস। সাত আটজন কাঁধে বাঁশ ঝুলিয়ে কী একটা মহাকায় জীবকে বয়ে আনছে।

সকৌতুকে এবং কৌতুহলে চন্দ্র চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন। মাদলের ধ্বনি ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। বাঁশের তূণে বোঝাই তীরের ঝকঝকে ফলা, গো-সাপের চামড়া দিয়ে বাঁধানো ধনুক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্র্যানাইটের তৈরী কিরাতের দল।

বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে এনেছে সদ্যোনিহত প্রকাণ্ড একটা দাঁতালো শূয়োরকে। মহিষের শিঙের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণ দাঁত ঠেলে উঠেছে প্রসারিত নাকের তলা দিয়ে। গায়ের অপ্রচুর ধূলিধূসর লোমগুলো দীর্ঘ এবং শাণিত। অপরিচ্ছন্ন কালো শরীরে আট দশটা তীর শরশয্যার মতো বিঁধে রয়েছে। সর্বাঙ্গে থক থকে গাঢ় রক্ত রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে আলকাতরার মতো চট্‌চট করছে।

চন্দ্র চৌধুরীকে সামনে দেখে সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানাল।

—কি রে, কী চাই তোদের ?

কালো মুখে সাদা সাদা দাঁত বের করে তারা হাসল। তাঁর প্রজা হতে চায় তারা। সেই উপলক্ষে শূয়োরটা তাদের উপঢৌকন।

—তাই বলে শূয়োর দিয়ে কী করব রে !

—খাবি বাবু।

—শূয়োর খাব ? বলিস কিরে—তোদের মতো সর্বভূক্ পেলি নাকি ? যা যা, ওটা তোরাই নিয়ে যা।

সাঁওতালেরা মলিন এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওদের শ্রেষ্ঠ উপচার ওরা জমিদারের জন্যই সাজিয়ে এনেছে। তাই প্রত্যাখ্যানের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওদের চোখে মুখে।

—তবে তোকে আমরা কী দেব বাবু।

চন্দ্র চৌধুরী সস্নেহে বললেন, কিছু দিতে হবে না। পালগাঁয়ের জঙ্গল তোরা সাফ করে দিবি, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাঁওতালদের মাদল বাজতে লাগল সোৎসাহে। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ যেন কতকালের গভীর একটা আচ্ছন্নতার তলা থেকে জেগে উঠল নীল বাহাদুরের ঘুমন্ত চেতনা। এ সুর কতদিন সে শোনেনি। চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সে কুমীর শিকার করতে গেছে, ইকড় ঘাসের মধ্য থেকে সোণালি বাঘকে গুলী খেয়ে লাফিয়ে উঠতে দেখেছে আগুনের হলকার মতো। কিন্তু আসামের পাহাড়ে সেই উন্মত্ত যৌবন। হড়পা বান নেমে ব্রহ্মপুত্র হাজার হাজার হাতীর মতো গজরে উঠছে। সে যেন জন্মান্তরের কথা।

জন্মান্তর? আজ এই মাদলের ধ্বনি যেন নীল বাহাদুরকে আবার জাতিস্মর করে তুলল। কোন ঝড়ের রাত্রে মর্মরিত অরণ্যের সুর। বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গাড় নামছে হুড় হুড় শব্দে। নদীর বুকের ওপর অনেকটা জুড়ে ফেনিল জলের বাষ্প-কুয়াশা, আর সেই কুয়াশায় রোদ পড়ে যেন ইন্দ্রধনুর মায়া জ্বলছে।

নীল বাহাদুরের ছোট ছোট চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল। চঞ্চল শুঁড়টা দুলতে লাগল বাজনার তালে তালে। উত্তেজনায় বেরিয়ে এল একটা প্রবল বৃংহণ ধ্বনি।

মাহুত বললে, এদের নাচ দেখে হাতীটার ভারী স্ফূর্তি হয়েছে হুজুর।

চন্দ্র চৌধুরী সকৌতুকে বললেন, হাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। গান গাইবারও চেষ্টা করছে।

সাঁওতালেরা কী বুঝলে কে জানে। কিন্তু নীল বাহাদুরকে ঘিরে ঘিরে

তারা নাচতে লাগল। উষ্ণ একটা আভিজাত্যের অনুভূতিতে ঝিমিয়ে এল নীল বাহাদুরের চোখ। কতদিন পরে সে অনুভব করেছে, শুধু ডাঙ্গস্ খেয়ে দিন কাটানোই তার শেষ কথা নয়, সে গজেন্দ্র, সে যূথপতি। আর অরণ্যের প্রতিধ্বনি হয়ে আরণ্য-মানুষ এই লোকালয়েও বয়ে এনেছে তার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।

পালগ্রামের মৃত সমৃদ্ধি কোন্ অলিখিত যুগের কাহিনী যে বহন করছে, ইতিহাস তার কোনো হদিশ দিতে পারে না।

বাঙলার পাল রাজাদের তলোয়ার একদিন সমস্ত উত্তর ভারতের আকাশে বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেছিল। দেবপাল, ধর্মপাল। চক্রবর্তী রাজাদের দুর্দান্ত প্রতাপে বাঙলার সমৃদ্ধি উছলে উঠেছিল সহস্র ধারায়। হয়তো তারি কোনো বিস্মৃত বুদবুদ এই পালগ্রাম। মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলার অজ্ঞাত শিলা লেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের বন্ধ-দুয়ার খুলে দিতে পারে। উত্তর বাঙলার মাঠে ঘাটে, বরেন্দ্র ভূমির কাঁকর মেশানো রাঙা মাটিতে অতীতের চূর্ণ কঙ্কাল।

স্বাধীনতার শ্মশানে এসে নতুন করে বাসা বাঁধল স্বাধীন মানুষের দল। কুঁচিলার বিষ মাখানো তীরের ফলা। নাগাড়া টিকারার রণ-দুন্দুভি।

সময় গড়িয়ে চলল। ভাঙা-পাথর আর গুঁড়ো ইটের তলা থেকে বেরিয়ে এল প্রকৃতির রসধারা—বর্ষার নতুন জলে লকলক করতে লাগল ধানের শীষ। তীর ছাপিয়ে কাঞ্চনের জল এসে নামল দুদিকের বিলে, সেই জলে টান ধরলে বোরোর ক্ষেতে যেন সোনা ফলতে লাগল। বনে জঙ্গলে এখন আর শূয়োর শিকার করতে হয় না, ভুট্টা আর আখের ক্ষেতে মাচা বেঁধে পাহারা দেয় সাঁওতালেরা। টুকরো টুকরো শাকের জমি চোখে স্নিগ্ধতার অঞ্জন বুলায়, ছোট ছোট তামাকের ক্ষেতে খসখসে পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপে। আর তারি মাঝখানে কলা বাগানে ঘেরা সাঁওতালদের গ্রাম। মাটি দিয়ে নিকানো পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, বাবলার খুঁটি। বারান্দার খাঁচায় দোয়েল শিস

দেয়, পচাইয়ের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বাঘের মতো তেজী কুকুর উঠোনে পড়ে ঝিমোয়।

ছবির মত গ্রাম।

ঠুন-ঠুন-ঠুন। ঠুন ঠুন ঠুনাঠুন। হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ বহু দূর থেকে ভেসে এল। চক্ররেখার মাঠের ওপারে একটা হাতী দেখা দিয়েছে। নীল মেঘের মতো তার প্রকাণ্ড চেহারা। বিরাট দুটি দাঁত সামনের দিকে দুখানা তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়ের সঙ্গে মস্ত একটা গাছের ডাল, মাঝে মাঝে সেটাকে মুখে পুরে দিয়ে চর্বণ চলছিল।

—জমিদার, জমিদার এসেছে।

মন্ত্রবলে যেন সাঁওতালপাড়া জেগে উঠল। ঢেঁকির কাজ ফেলে বেরিয়ে এল রূপোর নথ পরা মেয়েরা, আদমের প্রথম পুত্রের মতো বোরোর জমি থেকে উঠে এল কর্দম মলিন আধা উলঙ্গ পুরুষের দল। আধপোড়া ভুট্টা হাতে নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকিয়ে রইল মূঢ় আগ্রহে।

স্তম্ভের মতো চারটে মস্ত মস্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে নীল বাহাদুর। গলায় বাজছে পিতলের ঘণ্টা। মাহুতের পেছনে হাওদার ওপর দেখা গেল চন্দ্র চৌধুরীর মূর্তি।

নিয়মিত পাদক্ষেপে নীল বাহাদুর এসে পাড়ায় ঢুকল। ক্ষুদে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে যেন একবার সকলের কুশল সে জিজ্ঞাসা করে নিলে। পরিচিত, পুরাতন বন্ধুমণ্ডলী। নীল বাহাদুরের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের। কেবল নাচের তালেই ওরা নীল বাহাদুরকে সম্বর্ধনা করে না, তার সঙ্গে আছে কলামূলো-ভুট্টার প্রীতি উপহার।

—বৈঠ্, বৈঠ—

অঙ্কুশের তাড়া পড়ল মাথায়। বিশাল শরীরটাকে অতি কষ্টে সঙ্কুচিত করে পিছনের পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল নীল বাহাদুর। তলোয়ারের

মতো দাঁত দুটো মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে, পুরোণো শ্লেটের মতো কালো গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে নীচে। এ কথা আর অস্বীকার করার জো নেই যে, নীল বাহাদুরের বয়স বেড়েছে আগেকার চাইতে। গজেন্দ্রের চোখে তন্দ্রাবিলতা।

হাতী থেকে চন্দ্র চৌধুরী নামলেন। এই বারো বছরে তাঁকেও আর চেনা যায় না। বহুদিন জরাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, এতটুকু আমল দেননি। তাই জরা এসে যেদিন অধিকার বিস্তার করেছে, সেদিন এতটুকুও ফাঁক রাখেনি।

মাথার চুলগুলো শাদা। মুখটা অনবরত আপনা থেকেই নড়ছে। হাতের সিল্‌কের মতো পাতলা শাদা চামড়ার তলা থেকে ঠেলে উঠেছে মোটা মোটা নীল শিরা। তবুও ঈষৎ পিঙ্গল চোখের তারায় আজো সেদিনের সেই বহ্নি দৃষ্টি।

সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

—ভালো আছিস্ তোরা সব ?

ওদের মুখভরা কৃতার্থতার হাসি। ক্ষেতে কাজ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। সারা গায়ে জল আর কাদা, প্রকৃতির স্নেহ-নিবিড় স্পর্শ।

—ফসল কেমন রে এবার ?

—খুব ভালো ফসল বাবু। তিন বছরে এমন বোরো হয়নি।

চার পাঁচটা কাঠ আর বেতের আসন চারদিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে তখন। চন্দ্র চৌধুরী জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, এবার তা হলে খাজনা দিবি আমাকে ?

—খাজনা ? উদ্দীপনায় সাঁওতালদের চোখ জ্বলে উঠল এক সঙ্গে : তোর যা খুশি তাই নে না বাবু। তুই চাইলে—

—থাক থাক, অত ভক্তি দেখাতে হবে না আর—চন্দ্র চৌধুরীর দুই চোখে পিতৃস্নেহ : তোরা পালগাঁয়ের পোড়ো জমিতে ফসল ফলিয়েছিস,

এই আমার যথেষ্ট খাজনা। বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে আগে তো এখান দিয়ে মানুষ চলতে পারত না। তোরা হচ্ছিস আমার নিজের লোক, আমার জঙ্গী পলটন। তোদের কাছে আবার খাজনা কিরে!

গর্বে, আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় সাঁওতালদের উজ্জল চোখগুলো ছলছল করে এল।

ওদিকে নীল বাহাদুরকে ঘিরে আর এক পর্ব চলছে তখন। শিশু, বালক আর মেয়ের দল এসে ব্যূহ রচনা করেছে তার চার পাশে। নীল বাহাদুর তার বিশাল শুঁড়টাকে ভিক্ষার্থী একখানা হাতের মতো বাড়িয়ে দিয়েছে, দৈনন্দিন নিয়মমতো খাদ্য প্রার্থনা করছে সকলের কাছে। ছেলেদের হাসি এবং আনন্দধ্বনির মাঝখানে একটা কলা অথবা একটা ভুট্টা এসে পড়ছে তার শুঁড়ের আগায়। আর নীল বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজের মুখের ভিতর নিয়ে পুরে দিচ্ছে—আনন্দে তৃপ্তিতে ক্ষুধে ক্ষুধে চোখ দুটো বুজে এসেছে তার।

ফেরার পথে কেন কে জানে : অত্যন্ত অহেতুকভাবে উদাস আর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চন্দ্র চৌধুরীর মন। হাতির পায়ে পায়ে পুরোনো ইটের টুকরো মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে দুপাশে। বিজয়ী বিধর্মী শত্রুর মশাল কবে একদিন সহস্র শিখায় পালগ্রামের মাথার ওপর জ্বলে উঠেছিল। বিদীর্ণ শবদেহ—লাঞ্ছিতা নারী। তারপরে স্তব্ধতা—সেদিনের মৃত্যু অতিক্রম করে এতটুকু আলো এপারে এসে পৌছোয় না। চন্দ্র চৌধুরীর মনে হল, বার বার মনে হল : সেদিনের পালগ্রাম আবার জেগে উঠেছে নীরবতার সঞ্জীবনীতে। অত্যাচারী রাজার একক প্রতাপে নয়—বহু মানুষের, বহু মাটির মানুষের লৌহ কঠিন পেশীর শক্তি মুখে।

নীল বাহাদুরের গলার ঘণ্টাটা বাজতে লাগল ছন্দোময় দ্রুত তালে। ঠন্-ঠন-ঠন। ঠন-ঠন-ঠনাঠন। নির্জন মাঠ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঘণ্টার শব্দে।

কিছুদিন পরে পাগলা ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়ে চন্দ্র চৌধুরী মারা গেলেন

তারপর ইতিহাসের এম. এ. ইন্দ্র চৌধুরী গ্রামে জমীদারী করতে এলেন। চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের কাছে জমিদারী করবার মতো দুঃসহ ব্যাপার আর কিছুই নেই, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখেই গ্রামে বাস করতে এলেন ইন্দ্র চৌধুরী।

পিলখানায় মোটা শিকলে বাঁধা নীল বাহাদুরের চোখে ঘুমের জড়তা। তার কোনো কাজ নেই এখন। মদস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলো শুকিয়ে মরে গেছে তার—শ্লেটের মতো কালো চামড়া আরো অনেকখানি ঝুলে নেমেছে। তলোয়ারের মতো দাঁত দুটো একটু বাড়লেই কেটে নেওয়া হয় আজকাল, সেই দাঁতের আঘাতে আসামের পাহাড়ে আকাশ ছোঁয়া শাল গাছগুলো যে একদিন মড়মড় করে উঠত, সে কথা নীল বাহাদুরের মনেও পড়ে না।

তার জায়গা দখল করেছে ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্‌টিন। গ্রামের পথে বড় গাড়ি চালানো যায় না, কিন্তু দরকার হলে পাঁচ সাতজনে মিলে অস্‌টিন ঠেলে নদী নালা পার করে দেওয়া যায়। পল্লীজীবনের নিঃসঙ্গ প্রবাসে অস্‌টিনই একমাত্র সান্ত্বনা।

পিলখানার সামনে দিয়েই মৃদু গর্জন করে বেরিয়ে যায় মোটরটা। কৌতুক এবং কৌতূহলে নীল বাহাদুর তাকিয়ে থাকে এই অদৃষ্টপূর্ব যানটার দিকে। পেট্রোলের গন্ধ ভারী বিচিত্র মনে হয় তার। শুঁড়টা সামনে বাড়িয়ে শব্দ করে নীল বাহাদুর, নাকের মধ্যে টেনে নেয় গন্ধটা—জীবটার প্রকৃতিনির্ণয়ে চেষ্টা করে।

মাঠের পথে, গোরুর গাড়ি চক্রবিদীর্ণ অসমতলের ওপর ঝাঁকুনি খেতে

খেতে বেবি অস্টিন এগিয়ে চলে। জমিদারীর কাজকর্ম দেখা শোনা করবার চাইতে পথ-ঘাট বন জঙ্গলের প্রতিই ইন্দ্র চৌধুরীর কৌতূহল প্রবল। মুখের পাইপ থেকে কড়া বিলাতী তামাকের গন্ধ আসে, ষ্টিয়ারিঙের ওপরে রাখা স্থূল আঙ্গুলে হীরের আংটি ঝকঝক করে, আদ্দির পাঞ্জাবী হাওয়ায় উড়তে থাকে। আর পেছনের আসনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন নৃসিংহ মুখুয্যে—তাঁকে নইলে ইন্দ্র চৌধুরীর বেড়ানো হয় না। অথচ, মোটর জিনিসটা সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি আছে নৃসিংহের মনে। পাগলা ঘোড়ার চাইতেও এই কল কব্জাগুলোকে তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হয়। ধরো, মোটর যদি উলটে যায়? গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাই বা আশ্চর্য কি? গ্রামের যা পথ—পিছলে পুকুরে গিয়ে যদি পড়ে, তা হলে?

কিন্তু ইন্দ্র চৌধুরীর ভয় নেই। নৃসিংহের ভীরুতা ভারী উপভোগ্য মনে হয় তাঁর—জোর করেই অনেকটা তাঁকে তুলে আনেন তিনি। তা ছাড়া পাকা লোক নৃসিংহ। পথঘাট নদী নালার খবর তাঁর চাইতে বেশি আর কে জানে?

ঘ্রাস-স-স—আচমকা শব্দ হল একটা। মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বেবি অস্টিন থেমে গেল। নৃসিংহ ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলেন—কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটল নাতো?

কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু নয়। চলতি মোটরকে হঠাৎ ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্র চৌধুরী। দামী চশমার নীচে তাঁর ঐতিহাসিকের চোখ লোলুপ হয়ে উঠেছে।

পাশেই পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গা একটা। ভাঙা ইট আর পাথরের টুকরোয় অলিখিত ইতিহাস। মজে যাওয়া দীঘির পারে তালের বীথি শন শন শব্দে মাথা নাড়ছে।

—এটা কোন জায়গা মুখুয্যে মশাই?

—পালগাঁয়ের টিলা।

পালগাঁয়ের টিলা! ইন্দ্র চৌধুরীর চোখে মুখে কৌতুহল প্রখর হয়ে উঠল: আমার জমিদারীর ভেতর এমন একটা জায়গা যে থাকতে পারে সে তো ভাবতেই পারিনি।

নৃসিংহ বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন: আজ্ঞে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

—বাঃ, বলেন কী! টিলাটাকে দেখে কি মনে হয় না যে ওর তলায় পাহাড়পুরের মতো একটা প্রচ্ছন্ন বিহার কিংবা ওই রকম একটা বিরাট কিছু—

—আজ্ঞে?

নৃসিংহের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র চৌধুরী সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, চলুন, চলুন ওই পাড়াটা একবার দেখে আসি।

সাঁওতালদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে মোটরটার চারপাশে। কড়া তামাকের একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে ইন্দ্র চৌধুরী তাদের ধমকে উঠলেন:

—যা, যা পালা সব। দেখছিস তো, মোটর গাড়ি? চাপা দিয়ে একদম মেরে ফেলব, ভাগ।

মোটর গাড়ী, নীল বাহাদুর নয়।

বাড়ি ফিরে ইন্দ্র চৌধুরী নৃসিংহকে বললেন, ওই সাঁওতালগুলোকে তাড়িয়ে দিন।

নতুন জমিদারের ব্যবহার নৃসিংহের দুর্বোধ্য। চন্দ্র চৌধুরীর প্রায় সমবয়সী তিনি, এতটা বয়স পর্যন্ত প্রাণপণে জমিদারীর অন্ধি-সন্ধি আয়ত্ত করেছেন। দলিল জাল থেকে দাঙ্গার লাস গুম করা পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে তার বিচক্ষণতার অভাব হয়নি। কিন্তু—

—আজ্ঞে, ওদের তাড়াবেন কেন?

অপ্রসন্ন মুখে ইন্দ্র বললেন, খাজনা তো দেয় না, পুষেই বা কী লাভ।

কিন্তু সে সব ভাবছি না। দুশো টাকার জন্যে আমার হাহাকার নেই। কথা হচ্ছে, ওই টিলাটা আমি এক্সক্যাভেট করাব।

—আজ্ঞে?

—এক্সক্যাভেট করার মানে, খোঁড়াব। দশ হাজার, বিশ হাজার—যা লাগে। কে জানে হয়তো: একটা আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তিতে ইন্দ্র চৌধুরী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন: হয়তো ওই টিলাটার তলা থেকে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে—যার ফলে বাঙলার ইতিহাসই লিখতে হবে নতুন করে—কথার শেষ দিকটায় তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

উচ্ছ্বাসটা বুঝতে না পারলেও মূল ব্যাপার এতক্ষণে নৃসিংহের বোধগম্য হল।

—ওই টিলাটা খুঁড়তে হবে বুঝি?

—হাঁ এতক্ষণে বুঝেছেন।

নৃসিংহের কণ্ঠে সংশয় প্রকাশ পেল: কিন্তু ওদের তাড়ানো কি ঠিক হবে?

—ঠিক হবে মানে? উত্তেজনায় ইন্দ্র চৌধুরী সোজা হয়ে উঠে বসলেন: জানেন, ইতিহাসের কত বড় একটা তথ্য, হয়তো ওই টিলাটার নীচে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে? হয়তো পাল রাজাদের মূল্যবান কোন তাম্রশাসন হয়তো তাঁদের দিগ্বিজয়ের—হয়তো কত কী—আমি আর ভাবতে পারছি না।

নৃসিংহও কিছু ভাবতে পারলেন না।—কিন্তু ওদের উচ্ছেদ করে দিন। একমাস সময়—ফসল কাটা শেষ হয়ে যাবে। আর এর ভেতর কলকাতায় চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলছি আমি। আমার কী ভেবে আনন্দ হচ্ছে জানেন?

নৃসিংহ মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি জানেন না।

—আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, হয়তো টিলাটা এক্সক্যাভেট করিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার নাম!

—তা বটেই তো।

কিন্তু নৃসিংহ কিছু বুঝতে পারলেন না। অতীতের ইতিহাস! অতীতেই যা শেষ হয়ে গেছে, মাটির তলায় যা আত্মগোপন করেছে, বাইরের আলোকে তাকে টেনে আনবার, উদ্ঘাটিত করবার সার্থকতা কোথায়। মৃত যে, তাকে মৃত্যুর মধ্যে শেষ করে দেওয়াই তো ভালো। আজ অতীতের ভাঙা কবরের ওপর নতুন যুগের মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে, ফলে-ফসলে তাকে জাগিয়ে তুলেছে নতুন প্রাণের মধ্যে। সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর কঙ্কালকে পূজো করতে হবে—এ কোন্ দেশী খেয়াল?

যথাসময়ে খবর এল। সাঁওতালেরা অবাধ্য হয়ে উঠেছে—বেশি চাপ দিলে বিদ্রোহী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

লাঙ্গলের ফলা দুমড়ে বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা করেছে তারা। তীরের আগায় নির্বংশ করেছে দাঁতালো শূয়োরের পাল! বল্লমের মুখে বিঁধে তুলেছে দীঘির পারে ঘুমন্ত কুমীরকে। এত সহজেই তারা ছেড়ে দেবে না তাদের ঘর-বাড়ি।

কথা শুনে ক্রোধে ইন্দ্র চৌধুরী পাংশু হয়ে উঠলেন। দোর্দণ্ড প্রতাপের জমিদারী চালানোর বাসনা তাঁর নেই, প্রজার ওপর জোর করে নিজের রাজমহিমা প্রচার করবার মনোভাবও তাঁর নয়। কিন্তু বাঙলা দেশের বিস্মৃত ইতিহাস—জ্ঞান জগতের দাবী। এর চাইতে বড় কর্তব্য কী থাকতে পারে।

নৃসিংহ সবিনয়ে বললেন, কর্তামশাই ওদের বড় ভালোবাসতেন—

উগ্রস্বরে জবাব এল, তাইতেই তো মাথায় চড়েছে। যান আপনি।

নৃসিংহ চলে গেলেন। কিন্তু খুশি হয়ে গেলেন না।

দিনের পর দিন অবস্থাটা তিক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আকাশে বাতাসে খণ্ড যুদ্ধের আভাস। ইতিহাসের এম. এ. ইন্দ্র চৌধুরীর শিরা স্নায়ুতে দেবী কোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠেছে। কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞান লিপ্সাই নয়, শক্তিটাকেও একবার যাচাই করা ভালো।

আর পিলখানায় তন্দ্রাতুর নীল বাহাদুর কী একটা সন্দেহ করে। মাহুত আর তাকে তেমন সেবাযত্ন করে না আজকাল। অপ্রচুর খাদ্যে পেট ভরে না, চার দিকের আবর্জনা আর দুর্গন্ধে তার সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। ইন্দ্র চৌধুরীর আমলের সেই দিনগুলি। জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদাও সে সমানভাবে ভাগ এবং ভোগ করে এসেছে। জমিদারকে দেখে পথের দু'ধার থেকে যারা সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েছে, তাদের অভিবাদনের অনেকটা যে তারও উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে, এ কথা নীল বাহাদুর জানে।

কিন্তু এক বছরে কী পরিবর্তন। কী বিস্ময়করভাবে নিরর্থক হয়ে গেছে তার সমস্ত মূল্য। দিন কয়েক আগে দু-তিনজন লোক তাকে দেখতে এসেছিল। কী কথাবার্তা বলেছে কে জানে, কিন্তু তাদের সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চোখ নীল বাহাদুরের ভাল লাগেনি। কেন কে জানে তার সন্দেহ হয় এখানকার প্রয়োজন হয়তো তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা অশুভ সূচনার মতো মনে হয়, এখান থেকে হয়তো বিদায় নিতে হবে তাকে—সে অনাবশ্যক।

মৃদু গর্জন করে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা ছুটে যায় পিল্‌খানার সম্মুখ দিয়ে। ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্‌টিন। কত ছোট—অথচ কী আশ্চর্য গতিবেগ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধটা এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি শুঁড়ের ভেতর টেনে নেয় নীল বাহাদুর—ভারী বিচিত্র মনে হয় তার।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেন করে কে জানে: সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আসামের পাহাড়ে সেই হিংস্র মদমত্ত যৌবন যেন বহুদিন পরে ফিরে আসে নীল বাহাদুরের শিথিল শরীরে। মদস্রাবী গ্রন্থিতে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। পায়ের নীচে খাশিয়াদের পাড়া সে দলে পিষে চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু সে কবে—সে কবে! এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধূলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না?

ওদিকে ইন্দ্র চৌধুরী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন আর সমানভাবে বিপন্ন করে

তুলেছেন নৃসিংহকে। ওই টিলা তাঁর চাই। মামলামোকদ্দমা করে নয়, আইনের আশ্রয় নিয়েও নয়। অবাধ্য কতগুলো বন্য প্রজাকে যদি বাহু বলেই বশীভূত না করা যায়, তা হলে কিসের জমিদারী।

কিন্তু সাঁওতালদের ভয় করেন নৃসিংহ। উত্তর বাঙ্গলার শান্ত নিবিরোধ রাজবংশী নয় ওরা। গলায় তুলসীর মালা পরে না, কৃষ্ণের ইচ্ছার ওপরেই সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকে না। ওদের নাগাড়া টিকাড়া, ওদের রণ ডঙ্কা। ঝড়ের মেঘের মন্দ্র জাগে তার নির্ঘোষে।

মুখের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে ইন্দ্র চৌধুরী বললেন, বেশ, আমিই ব্যবস্থা করব।

দেউড়ির সামনে পায়চারী করতে করতে তাঁর চোখে পড়ল নীল বাহাদুরের বিশাল অবয়ব। শিকলে বাঁধা এই অতিকায় প্রকাণ্ড জানোয়ারটা মূর্তিমান অপচয় মাত্র। হাতীটাকে বিক্রী করবার চেষ্টায় আছেন তিনি, কিন্তু খরিদ্দার মিলছে না। অথচ দিনের পর দিন হাতীটার ভোজ্য সংগ্রহ করতে—

মুহূর্তে মগজের মধ্যে চমৎকার একটা মতলব খেলে গেল।

পিলখানার সামনে এসে ইন্দ্র চৌধুরী দাঁড়ালেন। কী কুশ্রী কদাকার জানোয়ারটা—বিধাতার সৃষ্টিতে কী পরিমাণ অস্থি মাংসের অপব্যবহার। সর্বাঙ্গে লোল স্থবিরত্ব। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে শারীরিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।

হাতীটার ছোট ছোট চোখ দুটোর দিকে তিনি তাকালেন। মনে হল, এই নির্বোধ বিশাল জানোয়ারটার চোখে কী একটা কথা মুখর হয়ে উঠেছে —যেন একটা মর্মভেদী দৃষ্টি পাঠিয়ে সে তার নিভৃত অন্তরের সমস্ত সন্ধান জেনে নিয়েছে।

চকিতে হাতীটার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তারপর মাহুতকে ডেকে আদেশ দিলেন, আজ থেকে তিন দিন হাতীটার খোরাক বন্ধ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নীল বাহাদুর অস্থির হয়ে উঠল। তিনদিন থেকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেয় না তাকে। সমস্ত দেহে মনে তার বিপ্লব। এরা কি তাকে অনাহারেই মেরে ফেলবার মতলব করেছে? বার্ধক্যের শেষ শক্তি দিয়ে নীল বাহাদুর বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করে, লোহার শিকলের আংটাগুলো মট মট করে ওঠে, পাথরের স্তম্ভটা নুয়ে পড়তে চায়। ব্যর্থ ক্ষুধা আর ক্ষোভে চোখের দুই কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, থেকে থেকে বেরিয়ে আসে কাতর আর্তনাদের মতো এক একটা বৃংহন ধ্বনি। সেই পাহাড় গুঁড়োনো শক্তি আজ আর নেই—নীল বাহাদুর আজ স্থবির, মৃত্যুর পথিক।

তৃতীয় দিনে ইন্দ্র চৌধুরী আর নৃসিংহ এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—আপনি হাতী নিয়ে বেরিয়ে যান মুখুয্যে মশাই, আমি মোটরে আসছি।

নৃসিংহের সমস্ত মুখ পাংশু এবং পাণ্ডুর।

—ব্যাপারটা একটু কেমন—

ইন্দ্র চৌধুরী কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, আর দেরী করবেন না, যান। তারপর বড় বড় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

বহুদিন পরে নীল বাহাদুরকে আবার বাইরে বের করে আনা হল। দড়ির হাওদা কষা হতে লাগল তার পিঠে। অসহ্য ক্ষুধায় দৃষ্টি অভিভূত—রাশি রাশি ওনকি উড়ছে শুধু। তবু ধৈর্য ধরে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। হাওদা কষা হচ্ছে, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই খাদ্য মিলবে।

কিন্তু খাদ্য মিলল না। দুর্গানাম জপ করতে করতে ভয়ার্ত নৃসিংহ হাওদায় উঠে বসলেন আর পরক্ষণেই মাহুতের সুতীক্ষ্ণ ডাঙ্গস এসে বিঁধল নীল বাহাদুরের মাথায়।

ক্ষিপ্তের মতো নীল বাহাদুর চলতে শুরু করল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা তার অবলুপ্ত হয়ে গেছে—মাথার ওপর ডাঙ্গসের তীব্র অনুভূতি। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে—অস্পষ্ট, আর ছায়ায় আচ্ছন্ন। নীল বাহাদুরের নীল মেঘের মতোই মহাবপুটা দুলতে লাগল—এক সঙ্গে জেগে

উঠেছে বুভুক্ষা আর বার্ধক্য। তবু আজ সমস্ত শক্তিকে শেষবার সংহত করে সে চলতে লাগল লক্ষ্যহীন অন্ধ চোখে। আর মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, পিছনে বহু দূর সে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটার অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে—হাওয়ায় আসছে পোড়া পেট্রোলের বিচিত্র গন্ধ।

সামনে পালগাঁয়ের টিলা। কলা বনে ঢাকা সাঁওতালদের গ্রাম—মজে যাওয়া দীঘির পারে তালের বন বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। পুরোণো পৃথিবীতে নতুন মানুষের সার্থক তপস্যা দেখা দিয়েছে ফলে ফসলে। নৃসিংহ মুখুয্যে ভাবতে লাগলেন: এদের নির্বাসিত করে প্রাচীনের কঙ্কালকে উদ্ধার করা—কী তার প্রয়োজন?

কিন্তু নীল বাহাদুর কিছু ভাবতে পারছে না। অসহ্য ক্ষুধায় সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এমন সময় তার নাকে ভেসে এল অপূর্ব একটা সৌরভ।

অপূর্ব সৌরভ বই কি। মুহূর্তে দেহের শিরা স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে তার। পাকা ফসলের গন্ধ—পরিপুষ্ট সোণালি ধানের গন্ধ। অন্ধ চোখ দুটো মেলতেই সে দেখল, সামনেই বিলের ধার দিয়ে বোরোর ধানে লক্ষ্মীর অজস্র করুণা। দু' পাশে যতদূর দেখা যায়, পাকা ধানের সানন্দ বিস্তার—মধুগন্ধী খাদ্যের আমন্ত্রণ।

তিন দিনের অভুক্ত নীল বাহাদুর পাগলের মতো ক্ষেতে গিয়ে পড়ল। মাহুত তাকে বাধা দিলে না, বরং আরো ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গিয়েই নামিয়ে দিলে তাকে।

পিছনে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা এসে থেমেছে। ইন্দ্র চৌধুরীর উত্তেজনা কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: খাইয়ে দে সমস্ত ধান, দলে পিষে শেষ করে দে। জমি ছাড়বে না—রামরাজত্ব পেয়েছে।

—ডুম-ডুম-ট্র্যম্।

সমস্ত সাঁওতাল পাড়াকে মুখর করে নাগাড়া বাজতে লাগল। পাল গ্রামের টিলার ওপর সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিকের দল।

হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক। সংশপ্তকের অস্ত্রের লক্ষ্য আজ বদলে গিয়েছে। জমিদারের হাতী এসে তাদের বুকের রক্তে ফলানো ধান নিঃশেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—দলে দিয়ে যাচ্ছে সারা বছরের জীবন সঞ্চয়।

নাগাড়ার সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ে আসতে লাগল: শাঁ-শাঁ-শাঁ। শাণিত দীর্ঘ ফলাগুলো নির্মমভাবে বিঁধতে লাগল নীল বাহাদুরের সর্বাঙ্গে: একটা অস্ফুট চীৎকার করে নৃসিংহ মুখুয্যে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

ক্ষিপ্ত নীল বাহাদুর পাকা ধানের গোছাগুলো উপড়ে উপড়ে মুখে পুরতে লাগল। তার সমস্ত শরীরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। দুই চোখের ওপর দিয়ে রক্ত নেমে আসছে—সারা গায়ে তীর বিঁধে রয়েছে সজারুর কাঁটার মতো। কিন্তু কোনটাতেই কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

দুম-দুম করে দুটো শব্দ হল বন্দুকের—দেবীকোট রাজবংশের শেষ প্রতাপ। আকাশ ফাটানো মানুষের কলরব জেগে উঠল। আর নীল বাহাদুরের সামনে অকস্মাৎ পৃথিবীটা একটা চাকার মতো ঘুরতে সুরু করে দিলে। তীরের ফলায় কুঁচিলা তার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া সুরু করে দিয়েছে—তীব্র আর্সেনিকের ক্রিয়া।

টলমল করে দুলতে লাগল যূথপতির দেহটা। শেষ শক্তিতে আর এক গুচ্ছ ধান মুখে পুরে দিয়ে সে টলতে টলতে পিছনে হটে এল, তারপর শুঁড়টাকে আকাশে তুলে একটা প্রচণ্ড চীৎকার করে আছড়ে পড়ে গেল মাটীতে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের মতো যান্ত্রিক-জানোয়ারটার অন্তিম আর্তনাদ। নীল বাহাদুরের বিরাট শরীরের চাপে সেটা পাখীর বাসার মতোই গুড়িয়ে গিয়েছে।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীপুলিন বিহারী সামন্ত, ৭০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লক ও মুদ্রণ—ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও। বেঁধেছেন—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

দু' টাকা

